দ্বিতীয় অধ্যায়

আশালতা সিংহের উপন্যাস

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আর আজ থেকে একশ বছর আগে পরিস্থিতি পরিবেশ যে অনেকটাই জটিল ছিল সে তো বলাই বাহুল্য। ঐ সময় যে সব মেয়ে সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছে তাদেরও নিন্দা ছাড়া কখনোই প্রশংসা জুটত তা। মেয়েদের জীবনের ওপর এই যে দুঃখের কালো আস্তরণ দীর্ঘদিন জমে ছিল তাকে খুব তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা সহজ নয়। তবে এও সত্যি মেয়েদের যে দুঃখ সয়ে থাকা, কোথাও ঘরছাড়া কিংবা অত্মহত্যা করা কিংবা সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়া এও এক ধরনের প্রতিবাদ প্রতিকূল সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়া মানেই হল মেয়েদের জন্য পুরুষতন্ত্রের নির্দেশিত ভূমিকা পালনের দায়কে অস্বীকার করা। আশালতা সিংহ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয় আশাপুরী।

উনিশ শতকের উপন্যাস রচয়িতা মেয়েরা যখন লিখছেন তখন তাদের খুব একটা খ্যাতির প্রত্যাশা ছিল না কারণ পারিবারিক সামাজিক ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে তারা উৎসাহ তো পানইনি বরং নিন্দাই জুটেছে। তবুও এরা লিখেছেন। সমাজ স্বীকৃত মূল্যবোধের যে তন্ত্র তা সর্বদা অনুসৃত হয়নি আশালতার লেখা উপন্যাস। মায়ের ভূমিকা, মেয়ের ভূমিকা, বধূর ভূমিকা পালন করে চলাই যে মেয়ে জীবনের একমাত্র সার্থকতা নয়। এইসব ভূমিকার বাইরে আমি যে আমি, আমি যে আমার কথা বলতে পারি — এটাই আশালতার কলম ধরার উদ্দেশ্য ছিল অন্তত তাঁর উপন্যাসে পড়া নায়িকাদের দেখে লেকথাই আমাদের মনে হয়। আশালতা সিংহের উপন্যাসের নায়িকারা প্রত্যক্ষ না হলেও তাদের কার্যকলাপের দ্বারা যে প্রশ্ন সমাজের দিকে ছুঁড়ে দেন তা হল — শুধু পুরুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কি মেয়েরা বেঁচে থাকবে?

আশালতা সিংহের উপন্যাসকে মূলত দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

১) নাগরিক জীবনের ছাপ রয়েছে এমন কিছু উপন্যাস।

২) পল্লী জীবনের ছাপ রয়েছে এমন কিছু উপন্যাস।

নাগরিক জীবনের ছাপ রয়েছে এমন উপন্যাস

‘অমিতার প্রেম’

আশালতা সিংহের প্রথম উপন্যাস ‘অমিতার প্রেম’। মাত্র ষোল বছর বয়সে আশালতা এ উপন্যাসটি লেখেন। উপন্যাসটিতে দেখা যায় আধুনিক রুচিশীলা তরুণী বয়স যার পনেরো ষোল বছর, ভালোবেসেছিল অমিয়কে। অমিতার বাবা ভবানীবাবু পশ্চিমের এক শহরে প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর ওই শহরে থাকতে না পরে কোলকাতায় মেয়েকে নিয়ে চলে এলেন এবং টালিগঞ্জে সুন্দর ছোট একট বাড়ি করে থাকতে লাগলেন। ছেলে অমল ইঞ্জিনিয়ার, দিল্লীতে স্ত্রীসহ থাকে। অমিতা বি.এসসি. পড়ছে, থার্ডইয়ারে, সেইসঙ্গে সাহিত্যচর্চা ও গান বাজনা করে। সে তার দাদার কাছ থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখেছে। পাশের বাড়ির লাজুক তরুণ অমিয়র সঙ্গে যোগাযোগ হয়। অমিয়র বোন চারুলতা যখন অমিয়র লেখা কবিতা দেখায় তখন সেই কবিতা প’ড়ে অমিতার অমিয়র সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জাগে। তাই অমিতাই তাদের বাড়ির গানের জলসায় অমিয়কে নিমন্ত্রণ করে। বোঝা যায় ছেলেদের সম্পর্কে অমিতার মনে কোন সঙ্কোচ নেই। তাই সে অচেনা এক তরুণকে অনায়াসেই ডেকে নেয়। এই অমিয় গভীরভাবে ভালোবাসল অমিতাকে। এদের শান্তজীবনে বিক্ষোভ এল যখন অমিতার দাদা অমল স্ত্রীকে নিয়ে কোলকাতায় এল। অমলের স্ত্রী বীণা অমিয়-অমিতার এ প্রেম ভলোবাসা অপছন্দ করে এবং তার আত্মীয় হেমেন্দ্রের সঙ্গে অমিতার বিয়ের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়। অমিতার ভালোবাসায় কোন খাদ ছিল না। কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান, অহমিকা বোধ, তাদের প্রেমের ওপর যেন একটা কালো আস্তরণ বিছিয়ে দিল। ওদের বন্ধন সূত্র ছিঁড়ে গেল। কিন্তু তা আবার জোড়া লাগল অমিয় বিদেশ থেকে ফেরার পর। অমিতার বাবা অমিয়কে স্নেহ করতেন এবং তিনিই তাদের যোগসূত্র হয়ে রইলেন।

প্রথম উপন্যাস‘অমিতার প্রেম’এ লেখিকা আশালতা সিংহের মনোভাব তৎকালীন সমাজ পরিবেশে যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো প্রগতিশীল। সে সময় মেয়েরা সাধারণত একটু আধটু লেখাপড়া শিখলেও সায়েন্স নিয়ে খুব একটা পড়তেন না। অমিতা বি.এসসি. থার্ড ইয়ারে পড়ছেন, বেথুন কলেজে। সেই কালে একান্নবর্তী পরিবারের চল থাকলেও অমিতাদের পরিবার নিউক্লিয়ার পরিবার, লেখিকা ছোট পরিবার সুখী পরিবার — এই থিওরিও ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি অমিতা তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন সচেতন পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তেমনি। পাত্র নির্বাচনের বিষয়টি সে দৈবের হাতে বা লজ্জার খাতিরে পিতা-মাতার ওপর ছেড়ে দেয় না, নিজেই বাস্তব সম্মত পথে পাত্রকে যাচাই করে নির্বাচন করে; আবার সামান্যতম আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে গভীর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ অমিতার

মত সম্ভ্রমশালী তেজস্বিনী মেয়ের কাছে লোকের ঘৃণা জিনিসটারও দাম আছে। সমাজের গড়ে দেওয়া ছকের বাইরে পা বাড়িয়েছে আশালতার সৃষ্ট নায়িকা অমিতা; সময়কালের হিসেব বড়ো হয়ে দাঁড়ায়নি আশালতার কাছে। অমিতা রামায়ণ, মহাভারত পড়ে না, হুগো মোপাসাঁ মূল ফ্রেঞ্চ থেকে প'ড়ে রস গ্রহণ করে। মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে সমাজের যেমন বিরূপতা, ক্ষেত্র বিশেষে আতঙ্ক তাকে যেন ধূলায় নস্যাৎ করে আশালতার উপন্যাসের নায়িকা।

অবরোধের যে পিঞ্জরে বন্দিনী হয়েছিল উনিশ শতক বা বিশশতকের প্রথম যুগের মেয়েরা, সে অবরোধের কোন বালাই ছিল না 'অমিতারর প্রেম' এর অমিতার মধ্যে। তাই তার নিজের চিন্তা করার শক্তি, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নেবার সাহস কোন কিছুই হারাতে হয় নি এই অসীম ব্যক্তিত্বয়ী অমিতাকে।

'দুই নারী' — 'অমিতার প্রেম' উপন্যাসের কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয়েছিল 'দুইনারী' উপন্যাস। বিবাহ বিচ্ছেদ ও নারী স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি সম্পর্কে একটা মতামত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন আশালতা সিংহ তাঁর 'দুইনারী' উপন্যাসটিতে। 'দুইনারী' উপন্যাসের দুজন নারী যথাক্রমে সুধীরা ও সুজাতা। দুজনেই ভালাবেসেছিল নীরেনকে। সুধীরার প্রথম প্রেমিক নীরেন, ওদের মন দেওয়া নেওয়া শেষ এবং বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে আসছিল। হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল সুধীরার বন্ধু অসামান্যা সুন্দরী সুজাতার। সুধীরার সঙ্গে নীরেনের দেখা হবার বহু পূর্বে সুজাতার সঙ্গে নীরেনের বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল। কেউ কাউকে চিনত না, নীরেনের তখন বিবাহের ইচ্ছা ছিল না এবং এ সম্বন্ধ ভেঙে যায়। সুজাতার বিবাহ হল সরোজের সঙ্গে, ভালোবেসে বিবাহ। মদ্যপ চরিত্রহীন সরোজকে ত্যাগ করে সুজাতা ডিভোর্সের মামলা আনে। বিবাহ বিচ্ছেদ শব্দটাই সমাজে আলোড়ন তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল সেই সময়, তুলেও ছিল যথেষ্ট আলোড়ন। নারী-পুরুষ সম্পর্কে সমাজের দ্বৈত মানদণ্ডই যে নারী সমস্যার কারণ স্বচ্ছ দৃষ্টিতেই ত দেখেছিলেন আশালতা সিংহ। যদিও সুজাতার আনা ডিভোর্সের মামলা টেঁকেনি। এই সময় নীরেনের সঙ্গে সুজাতর পরিচয় হয়। সুধীরার মনে আসে ঈর্ষা, মনান্তর, ছাড়াছাড়ি হয় নীরেনের সঙ্গে। সুজাতাকে ভালোবাসে নীরেন, সুজাতারও নীরেনের প্রতি প্রেম জন্মায় কিন্তু বাঁধা এসে দাঁড়ায় - সুজাতা তার পূর্ব স্বামী সরোজের সন্তান গর্ভে ধারণ করছে, নিয়তির কাছে হার মানল সুজাতা। সুজাতার সঙ্গে সরোজের দেখা হয়, একটা যেন জোড়াতাড়া দিয়ে মিল, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় সুজাতার। সুধীরা বিয়ে করে নীরেনের এক বন্ধুকে। নীরেন নিঃসঙ্গই রইল।

উপন্যাসটিতে একটি মেয়ের উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা রুজু করা যত না বিস্ময়কর তার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর হল নীরেন নামক এক বাঙালী পুরুষের চোখে সুজাতার মতো

মেয়ে সম্মান পাচ্ছে। ডিভোর্সের ঘটনায় নীরেনের মনে হয় সুজাতা যথেষ্ট তেজস্বী ও স্বাধীন মনের অধিকারিণী। কাগজে খবরটা প'ড়ে নীরেনের মনে 'সম্ভ্রম জাগল' এবং সে ভাবল —

> ''আজকালকার মেয়েরা তা হলে নিতান্ত অবলা নয় আশা করা যেতে পারে, ইংরেজী কিংবা ইউরোপীয় কোন ভাষায় যেমন অবলা শব্দের কোন প্রতিশব্দ নেই; কুড়ি বছর পরে বাংলাদেশের অভিধান থেকেও শব্দটা তেমনি মুছে যাবে।''[১]

আশালতার আজীবনের আকাঙক্ষা স্বাধীনতা এবং সম্মান। নিজের সেই ইচ্ছা আকাঙক্ষাকে খানিকটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন নায়ক নীরেনের মধ্যে। তবে নীরেন সুজাতাকে যতই শ্রদ্ধা করুক সমাজ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যে তাকে তেমন সুনজরে দেখবেনা এটা সুজাতা সহ তাঁর স্রষ্টা আশালতা সিংহও জানেন।

সুজাতার সঙ্গে সরোজের যে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়েছিল তা খানিকটা সরোজেরই জেদে। সেন্টিমেন্টের বিন্দুমাত্র ধার না ধারা সরোজের নতুন কিছু করার প্রয়াস এই বিবাহে যেমন সিদ্ধ হল তেমনি সুজাতারও অতি আধুনিক স্বামী পেয়ে মনে মনে বেশ আনন্দই হয়েছিল।

সরোজের বিশেষ বন্ধু ইউরোপীয় ফরেস্টার সাহেবকে সরোজ বলে যে ভারতীয় নর নারীর হৃদয় মাহাত্ম্য অনেক বেশী; এতে ফরেস্টার হাসতে হাসতে বলেন যে, ''... এখনও তুলনা করবার দিন আসেনি। আগে আপনাদের স্ত্রী পুরুষ আমাদের মত সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক এমনকি পারলৌকিক মতামতের তরফ থেকেও একেবারে নির্ভেজাল স্বাধীনতা পাক, তারপর দেখা যাবে হৃদয়ের তাপমান যন্ত্রে কার কত ডিগ্রী ওঠে।''[২] যাই হোক, ফরেস্টারের সঙ্গে সরোজ তর্কে হারলেও বিয়ের প্রথম ছ'মাস ওদের জীবনে এত সুখ ছিল যে তাতে তাদের যেন চেতনা নেই — এমন অবস্থা। এরপর সরোজের বাবা সরোজকে আলাদা ফ্ল্যাটে স্ত্রীকে নিয়ে স্বাধীন সংসার পাতার প্রস্তাব দেয়। ভারতবর্ষে চিরকালই একান্নবর্তী পরিবার উচ্চাসন পেয়েছে। সরোজের বাবা সহ লেখিকার মত এ ব্যপারে পাশ্চাত্য নীতিকেই অনুসরণ করেছে। আলাদা ফ্ল্যাট নেবার ক্ষেত্রে সরোজের স্ত্রী সুজাতা যখন আপত্তি করে বলে যে, বৃদ্ধ একা শ্বশুরের এতে কষ্ট হবে তখন সেই শ্বশুর মশায় ভাবেন —

> ''এ বেচারাকে বর্তমান যুগের ফোর্ডিজম সম্বন্ধে কিছু তথ্য জনিয়ে দিই যে কারুকে দেখা শোনা সুবিধের জন্য কারো জীবন নয়। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ, স্বাধীনতা, উন্নতি, এফীশিয়েন্সি।''[৩]

— এটা লেখিকা আশালতা সিংহেরও মনের কথা। কিন্তু মনের কথা লিখলেই শুধু হবে? সামাজিক-

পারিপার্শ্বিক লোকেদের কোন্‌টা ভালো লাগবে, তারা কোন্‌ ধরনের চিত্র-চরিত্র দেখতে চায় - সেটা ভাবতে হবে না? হবে বৈকি! তাই তো আবার সেই শ্বশুর মশায়ের মুখ দিয়েই বলান — 'ফোর্ডিজমের লেকচারটা যখন মুখে মুখে তৈরী হয়েছে তখন তার হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, সরোজের বৌয়ের মুখের উপরে। সে কি সুন্দর মুখ! সংসারে এমন জিনিষও আছে সেকথা তিনি ভুলতে বসেছিলেন প্রায়। ... এবং আলাদা করে ফ্ল্যাট্‌ নেওয়ার প্রসঙ্গটাও চাপা পড়ে গেল।''[৪] আশালতা চলমান জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন, মেলাবার জন্য সংঘর্ষ করেছেন। এই সংঘর্ষ নিজের পরিশীলিত মানসিকতার সঙ্গে গ্রাম্যতার। অসংস্কৃত পুরুষতান্ত্রিক সামজব্যবস্থাকে আশালতা কোনদিনও মনে প্রাণে মানতে পারেন নি।

'আমিতার প্রেম', 'দুই নারী' আশালতার প্রথম জীবনের লেখা উপন্যাস। আমরা আগেই জেনেছি যে আশালতার যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তখন আশালতা বেশিরভাগ সময় বাপের বাড়ি ভাগলপুরেই থাকতেন। এরপর ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ কিছুদিন ভাগলপুরে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতেন। আশালতাও স্বামীর সঙ্গেই থাকতেন তবে তিনি সম্ভবত তাঁর শ্বশুরবাড়ির গ্রাম্য পরিবেশে থাকতে অপচ্ছন্দ করতেন উপরন্তু তাঁর শ্বশুরবাড়িতে লেখাপড়া করতে হলে আশালতাকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হত। আর আশালতা ভীষণ বই পড়তে ভালো বাসতেন। প্রাক্‌ বিবাহ কালে আশালতার হেমেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি একটা চাপা ভালোলাগা-ভালোবাসা ছিল। হেমেন্দ্রলাল হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দাদা হরেন্দ্রলাল রায়ের মেজ ছেলে। হেমেন্দ্রলাল সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, তিনি শুধু গান গাইতেন না গান লিখতেনও। এই হেমেন্দ্রলালের প্রতি আশালতার হৃদয় দৌর্বল্যের কথা স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ জানতে পেরে বিষয়টাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি। এদিকে দেওরের মৃত্যুর জন্য আশালতাকে স্বামীর সঙ্গে ভাগলপুর ছেড়ে দুবরাজপুরে যেতে হয়। এই দুবরাজপুর থেকে আশালতার শ্বশুরবাড়ি বাতিকার গ্রাম বেশি দূর নয়।

ভালপুরের উদার সংস্কৃতি মনস্ক পরিবারে জন্মানোর দরুণ আশালতা প্রগতিশীলা, ইংরেজী সাহিত্য-দর্শন ইতিমধ্যে প্রচুর পড়েছেন এবং পুরুষের অকারণ শাসন কিছুই প্রায় জীবনে দেখেননি তখনও; কিন্তু রক্ষণশীল জমিদার বাড়ির গ্রাম্য পরিবেশে বিবাহ সূত্রে এসে আবদ্ধ হলে বিশেষত দুবরাজপুরে থাকাকালীন শ্বশুরবাড়ির সান্নিধ্যে এলে ঐ গ্রাম্য অসংস্কৃত অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে তাঁর খাপ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ডাক্তার হলেও রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায় যখন দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের স্ত্রীকে জব্দ করতে পেশায় ডাক্তার লেখক বনফুলকে উৎসাহিত করেছিলেন আশালতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতে। বনফুল ১৩৪০ এর বৈশাখ সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'-তে ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন 'আশাহতা'। দীর্ঘ কবিতাটি ক্লান্তিকর লাগবে ভেবে এর কিছু কিছু অংশ তুলে ধরছি —

... ডালিমের দিন যায়
আসে কত ক্রেতা, টিপেটুপে শুধু
ফেলে রেখে যায় হায়!
কাবুলিওলার কাবুলিয়া পণ
দরে না বনিলে করে না ওজন
...

ধনীর লাগিল ধোঁকা
বাড়ী গিয়ে দেখে ডালিমের মাঝে
রয়েছে বেজায় পোকা!
চটিল বেচারা, ভাবিল — এটারে
দূরে দিই ফেলে '' — আবার কে তারে কহিল' কিনেছ, খাও ঝেড়ে ঝুড়ে,
কিনেছিলে কেন বোকা!
....

ওগো ও ডালিম ফুল
কে ঘটাল তব জীবন কাব্যে
এমন ছন্দ ভুল!
তোমার গভীর বেদনার কথা
বুঝেছি বুঝেছি ওগো আশাহতা
তোমার লাগিয়া এখনও কাননে
কাঁদিতেছে বুলবুল,
কণ্ঠভরা সে সঙ্গীত তার
বিরহ বেদনা-কুল![৫]

কবিতাটি যে বনফুলেরই লেখা তা স্বয়ং পরিমল গোস্বামী ('শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক) ১৩৬৫ সনের শ্রাবণে (জুলাই-১৯৫৮) তাঁর প্রকাশিত 'স্মৃতিচারণ' বইতে কবুল করেছেন। আশালতার ডাক নাম ছিল ডালিম। হেমেন্দ্রলাল সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন তাই এখনে তাকে বুলবুল বলা হয়েছে। ধনীর দুলাল এখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এবং সে যে ডালিম ফল ঘরে এনেছে সে ডালিমে রয়েছে বিরাট পোকা অর্থাৎ নষ্ট ডালিম। কবিতাটিতে বনফুল আশালতাকে ইঙ্গিতে চরিত্রহীন নষ্ট মেয়ে বলতে চেয়েছেন। পরিমল গোস্বামী আরও জানাচ্ছেন — আক্রমণটা এমন যৌথ এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির হত না, যদি দ্বিজেনবাবুর ইচ্ছা অন্যরকম হত।'[৬]

পত্র পত্রিকায় নারী লেখিকা আশালতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, স্বামী-শ্বশুরবাড়ির প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মনোভাব ধীরে ধীরে আশালতাকে যেন একরকম বাধ্য করে তাঁর লেখার পরিবর্তন সাধনে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল আশালতার নায়িকারা যেন আপোস করতে শুরু করেন। আসলে নারী লেখিকারা কী লিখবে, কী লিখলে সমাজ গ্রহণ করবে, তার কিছু অলিখিত শর্ত আছে। যারা এ শর্ত ভঙ্গ করবে, কোমল গলায় কথা বলবে না, তাঁদের লেখা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পছন্দসই হবে না।

'মানসী' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'মানসী' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩৪১বঙ্গাব্দ। প্রকাশচন্দ্র সরকার অ্যান্ড কোং থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুরমা এবং সোমনাথ। সুরমা ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। সুরমার পিতা দেবকুমারবাবু একজন নামকরা ব্রাহ্ম, তিনি প্রায় ব্রাহ্মমন্দিরে যান এবং বক্তৃতা দেন। সুরমার মা-ও আধুনিক মহিলা, তিনি প্রায়ই বিভিন্ন পার্টিতে যান। সুরমা শিক্ষিতা, প্রগতিশীলা, আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সুরমা আগ্রাসী পাঠক, বই পড়তে সে খুবই ভালোবাসে। যে সমস্ত লেখকের বই সুরমা পড়ে তাঁর মধ্যে যেমন আছেন রবীন্দ্রনাথ তেমনি আছেন শেলী, হাক্সলি।

এমনই ব্যক্তিত্বময়ী সুরমার সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়ার পালা চলে মিতভাষী, বিনয়ী সেমনাথের। সুরমা-সোমনাথকে পছন্দ করলেও সুরমার পরিবার সোমনাথের সঙ্গে সুরমার বিয়ে দিতে চায় না কারণ সোমনাথ ব্রাহ্ম নয়। সুরমা কিন্তু বাড়ির লোকেদের চাপিয়ে দেওয়া মত মানতে পারে না। সুরমা বলে —

> '' বাবার কতকগুলো বিশেষ প্রিজুডিস থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে নিজের মতামত তিনি অপরের স্কন্ধে চাপাবেন কেন!''[৭]

বাড়ির অমতে, আত্মীয়-স্বজনদের আপত্তিকে নাকচ করে শেষ পর্যন্ত সুরমা-সোমনাথ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এমনকি সুরমা শ্বশুরবাড়িতে প্রাপ্য মর্যাদা না পেলে স্বামীকে নিয়ে কোলকাতায় ফ্ল্যাট বাড়িতে নিজের সংসারের নীড় রচনা করে। বেশ কিছুদিন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে চলার পর সুরমার যেন ঘোর কাটে। সুরমা নিজের সত্তাকে খুঁজতে তৎপর হয়। সুরমার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছে সোমনাথের উপর।

সুরমার মনে হয়েছে — সোমনাথকে তো ''কিছুই ছাড়তে হয়নি, তিলে তিলে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। ..... ''[৮] । কিন্তু সুরমার জীবনে কোথায় অখণ্ড অবসর যেখানে সে নিজেকে নিয়ে ভাববে, নিজের আত্মার মুখোমুখি হবে।

শেষ পর্যন্ত সুরমা অবশ্য স্বামী সোমনাথকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই প্রত্যাবর্তন করেছে। শ্বশুরবাড়িতেই সুরমা নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

'বিয়ের পরে' — শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা 'বিয়ের পরে' উপন্যাস কমলিনী সাহিত্য মন্দির থেকে ১৩৪২ এর ২৪ ফাল্গুন প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে অধ্যায় বিভাজন নেই।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজয়া। বিজয়া ধনী পরিবোরের মেয়ে। নিজের পরিবারের অমতে গিয়ে বিজয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সুরজিতকে বিবাহ করেছে। বিজয়ার মা সরোজিনী দেবী মেয়ের এই বিবাহ মেনে নিতে পারেননি।

বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বিজয়া শ্বশুরবাড়িতে এসে প্রথমে গৃহস্থালীর ছোটোখাটো কাজ আনন্দের সঙ্গে করলেও অচিরেই তার ভুল ভাঙ্গে। ছাপোষা মধ্যবিত্ত ঘরের নিত্য নৈমিত্তিক অভাবের মধ্যে পড়ে বিজয়া নিজের ভুল বুঝতে পারে। বিজয়ার মা সরোজিনী দেবীও মেয়ের এই হতদরিদ্র রুক্ষ শ্রীহীন চেহারা দেখে ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন —

'' তোর জীবন যে এমন হবে স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি মা। তুই যেন জেনে-শুনে-ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করে বসলি।''[৯]

বিজয়াও স্বামী সুরজিত ও তার হত দরিদ্র শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে নিজের সুখের জন্য পিতৃগৃহে ফিরে আসে।

নিজের পিতৃগৃহে এসে বিজয়া পূর্বের মতো আরাম আয়েসে দিন কাটালেও স্বামী সুরজিতের কথা তার বারে বারে মনে হয়েছে।

''সুসজ্জিত সুন্দর ঘরের একাকীত্ব পাষাণ ভারের মত তাহার মনে চাপিয়া ধরিল।''[১০]

বিজয়া অবশ্য পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং স্বামী সুরজিতের কাছে ফিরে আসে। সুরজিত ও ততদিনে নিজেকে বিজয়ার যোগ্য করে তুলেছে। সুরজিত উচ্চবিত্ত সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যদিও এই উপন্যাসে পটভূমি কোলকাতা। উপন্যাসে লেখিকা আশালতা সিংহ একদিকে যেমন উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনচিত্র বর্ণনা করেছেন তেমনি অন্যদিকে বিজয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার আত্মবিবর্তনের রূপটিও ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আবির্ভাব' — এই উপন্যাসটি আশালতা সিংহ 'অমিতার প্রেম', 'মুক্তি' প্রভৃতি উপন্যাসের পরে লেখেন। উপন্যাসের শুরুতেই সুজাতা নামের একটি পরিচ্ছেদে লেখিকা মেয়েটির সম্পর্কে পাঠকদের জানাচ্ছেন পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতো সিনেমা দেখে, শাড়ির রঙ পছন্দ করে কিম্বা হালকা গোছের গান গেয়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলে না। জীবনকে সে অত্যন্ত গভীরভাবে দেখে, মিতভাষিণী, সুন্দরী এই মেয়েটি নিজের জগৎ নিয়ে যেন মেতে আছে। মিস্টার বসু বার লাইব্রেরীতে বসে নরেন রায় নামক জনৈক ভদ্রলোকের সামনে বলছিলেন — "... ব্যানার্জ্জি সাহেবের ছোট মেয়ে সুজাতা দেবী — কতো পড়াশোনা, কী কালচার! কিন্তু প্রাণের হিল্লোল নেই।"[১১] সুজাতা শুধু ভক্ত দলের মধ্যেই নয়, সঙ্গিনীদের মধ্যেও সে ছিল ভাবুক প্রকৃতির। সাজগোজ, সিনেমা এসব আলোচনাতেও তার রুচি ছিল না। সুজাতার বাড়ির পরিবেশও তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু বাড়ির মতো নয়। আব্দুল নামে একজন মুসলমান চাকর সেখানে কেক, বিস্কুট, রুটি, জ্যাম প্রভৃতি সহযোগে টেবিলে বাড়ির সকলকে সকালে চা-পরিবেশন করছেন। এমন একটি দৃশ্য লেখিকা বর্ণনা করেছেন 'মা ও মেয়ে' নামক অধ্যায়ের প্রথম দিকে। তবে মা মালতীদেবী ঐ টেবিলে বসে চা পান করেন না। তিনি ভেতরে ভাড়ার ঘরে নিজের হাতে চা বানিয়ে নেন।

আশালতা সিংহের লেখা বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের মতো সুজাতারও ভোরে ওঠার অভ্যাস। এরই সঙ্গে সূর্যোদয় দেখা, আকাশ ও প্রকৃতিকে মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করা। সকালে সকলের সঙ্গে বসে চা পান করতেও সুজাতার ভালো লাগে না। সে তার মায়ের সঙ্গেই চা পান করতে ভালোবাসে। সুজাতার এধরনের মনোভাবে দিদি লীলা বলে যে বিয়ের পর ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর ভার নিতে হবে, কাজেই সমাজে-পরিবারে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। মেয়েদের কি শেখা উচিত, কি করা উচিত নয়, তার একটা ইঙ্গিত লীলা জানিয়ে রাখছে। কারণ লীলা জানে বোন সুজাতা এভাবে একা একা নিজের ভাবাবেগকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়ে চললে পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাকেই অসুবিধায় পড়তে হবে। সুজাতা খদ্দর ছাড়া অন্য কিছু পরে না। তার মধ্যে সাদা রঙের শাড়ি তার বেশি পছন্দ। সুজাতার মা মালতী দেবী মেয়ের সঙ্গে গল্প করেন। মালতীদেবীর সময়কাল কেমন ছিল জানতে চাইলে তিনি জানান সে সময় ষোল সতের বছর বয়সে তিনি রীতিমতো ঘরের বউ। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ফাই-ফরমাস খেটে আনন্দেই তাদের দিন কাটতো। আপাতদৃষ্টিতে খুব হালকা ভাবে কথাটি বললেও লেখিকা এখানে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিএকটা কটাক্ষ করেছেন। সুজাতার মায়ের সময়কালে শ্বশুরবাড়িতে দিন-রাত্রি দাসীবৃত্তি করাই যেন মেয়েদের কাছে পরম সুখ-সৌভাগ্যের। এর বেশি কীইবা চাইতে পারে একটি মেয়ে। আর একধরনের মেয়ে লীলা যারা পার্টিতে

যায়, নিত্যনতুন শাড়ি ব্লাউজ কেনে, আড্ডা দেয়, টেনিস খেলে, জীবনটা উপভোগ করে। এই কাজগুলোই এতই নিন্দনীয় — এ প্রশ্নও তুলে ধরেছেন লেখিকা আশালতা সিংহ।

'সুপ্রকাশ' নামক অধ্যায়টিতে দেখি সুপ্রকাশ অতিশয় পরিপাটি, মার্জিত এবং নিভাঁজ নিখুঁত একটি চরিত্র আর সেইসঙ্গে তার লেখার ধরনটিও অনুরূপ, সামাজিক মানুষ হিসাবে সুপ্রকাশের সুখ্যাতিও যথেষ্ট। তবে তার লেখার বিরূপ সমালোচনা যে হয়না তা নয়। অনেকের মতে তার স্টাইলের বাড়াবাড়িতে আসল লেখাটি মাটি হয়। যে যাই বলুক সুপ্রকাশের ব্যক্তিত্ব এবং চেহারা ছিল দীপ্তিময়। এহেন অবিবাহিত সুদর্শন সুপ্রকাশ মিসেস গুপ্তের পার্টিতে হঠাৎ দেখে সুজাতাকে। ঘরের একটি প্রান্ত পশ্চিমদিকের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে সুজাতা তখন সূর্যাস্ত দেখছিল।

আশালতার প্রায় উপন্যাসেই নায়কেরা নায়িকাদের হঠাৎই দেখে, আর দেখে বিশেষত সেই মেয়েটির মধ্যে স্থির, গভীর প্রশান্তি অথবা প্রখর ব্যক্তিত্বময়ীকে; দেখে তারা মুগ্ধ হয়। বলা বাহুল্য এই এক দেখাতেই নায়কেরা প্রত্যেকেই প্রায় প্রেমে পড়ে। সুজাতাকে দেখে সুপ্রকাশের কথা থেমে যায়। এবং সুজাতা সম্বন্ধে তার তীব্র কৌতূহল উৎসাহে পরিণত হতে সময় লাগে না। অন্যদিকে সুপ্রকাশ ব্যক্তিটিকে না চিনলেও তার লেখা গল্প উপন্যাস প'ড়ে সুজাতার তার প্রতি কোনো অনুরাগ জন্মায় নি। বরং খানিকটা বিরক্তিই রয়েছে। এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য হলো —

> ''সুপ্রকাশ বাবু যা নিয়ে বই লেখেন, তার সাহিত্যিক মূল্য কতখানি জানিনে, কিন্তু সেটা এমনই জিনিষ যা নিয়ে তরুণ তরুণীরা সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজনার থেকেও অপ্রমত্ত সৌন্দর্যের বোধকে তারা আলাদা করতে পারে না।''[১২]

এরপর অজিতাদের বাড়িতে তার দাদার জন্মদিনের উৎসবেও বহু অভ্যাগতদের মধ্যে একদিকে যেমন সুপ্রকাশ এসেছে, অন্যদিকে সুজাতা ও তার দিদি লীলাও সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান বাড়িতে তাই সুপ্রকাশের সুজাতাকে দেখবার আরো একবার সৌভাগ্য ঘটে। লীলার সঙ্গে সুপ্রকাশের পরিচয় করিয়ে দেয় অজিতা। সুপ্রকাশের সঙ্গে আলাপ করে লীলার মনে হয় সুজাতার প্রতি সুপ্রকাশের যেন বেশ খানিকটা আগ্রহ রয়েছে। সপ্রতিভ, সুদর্শন, ভদ্র ছেলেটিকে পাত্র হিসাবে মন্দ লাগে না। বাড়ি এসে লীলা তার মা মালতীদেবীকে জানায় সুজাতার জন্য সুপ্রকাশ পাত্র হিসাবে ভালই হবে। সেই এও জানায় ছেলিটি শিক্ষিত, রুচিবান এবং যে যথেষ্ট ধনী পরিবারের। কাজেই এমন ছেলের হাতে পড়লে সুজাতার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। এদিকে সুপ্রকাশ ও তার বোন নীরা সুজাতার সহপাঠিনী। তারই কাছ থেকে সুপ্রকাশ সুজাতার সম্পর্কে নানা কথা জানতে চায়। এমন একটা মনঃপুত বিষয় পেয়ে নীরারও বেশ উৎসাহ জাগে।

'নিমন্ত্রণ' অধ্যায়টিতে দেখি সুপ্রকাশ নিজের ঘরে যখন বসে আছে, এমন সময় তার বোন নীরা টেবিলের উপর নীল রঙের একটি পুরু খাম যাতে রয়েছে সুজাতাদের বাড়িতে সুপ্রকাশের চায়ের নিমন্তরণ। আনন্দিত সুপ্রকাশ জানায় তার কাব্যের মানসীকে কেন সকলে যে তোড়জোড় করে ড্রয়িংরুমের আবহাওয়ায় নামাতে চায়, তখন বোন নীরা পরিহাস করেই উত্তর দেয় যে —

> ''তার কারণ অশরীরী প্রেম এবং অদেহী কল্পনায় যে মেয়েদের কোনো সুখ নেই। ব্যাপারটাকে যতক্ষণে না পার্থিব কোঠায় নামিয়ে আনতে পারি ততক্ষণ আমাদের স্বস্তি কোথায়?''[১৩]

সুপ্রকাশ সুজাতাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে লীলা তাদের মা মালতীদেবীর সঙ্গে সুপ্রকাশের পরিচয় করান। মালতীদেবীকে দেকে সুপ্রকাশের মনে হয় —

> ''তাদের সমাজের কোন তরুণী এমন কি অনেক প্রৌঢ়া এবং বয়স্থা মহিলার মুখেও সে কখনও এমন শান্তির আভাস দেখে নাই।''[১৪]

মালতীদেবীর চরিত্র বৈশিষ্ট দেখে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের আনন্দময়ী বা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের বেণী ঘোষালের মা তথা জ্যাঠাইমাকে আমদের মনে পড়ে। এর আগে সুপ্রকাশ যে সব প্রৌঢ়া মহিলাদের শিষ্টালাপ করেছে তা যেন সবই ছিল কৃত্রিমতায় ভরা। সেসব কথাবার্তা প্রায় সবই ছিল একটা সভ্য, ভব্য ছদ্মবেশ।

> ''মানুষ যে নিজেকে গোপন করিতেই ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে এই কথাটার সত্যতা সকল মুহূর্তে সে তীব্র ভাবে অনুভব করিয়াছে।''[১৫]

'আবিষ্কার' নামক অধ্যায়টিতে দেখি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সুপ্রকাশ সুজাতাদের বাড়ি এসেছে। তাদের বাড়িতে সেদিন কিছুক্ষণ আগেই পৌঁছে সুপ্রকাশ দেখে যে বাড়িতে সুজাতা নেই। সুজাতা ইচ্ছাকৃতভাবেই তার মাসির বাড়িতে চলে যায় সুপ্রকাশকে এড়ানোর জন্য। ইতিমধ্যে সুজাতা তার বান্ধবীকে সুপ্রকাশ সেনের নতুন উপন্যাস 'ব্যবচ্ছেদ' সম্পর্কে, তার মতামত জানিয়ে চিঠি দেয়, তা এক রকম ঘটনাচক্রে সুপ্র কাশের হাতেই পড়ে যায়। চিঠিতে নিজের নামটি উল্লেখ রয়েছে দেখে কৌতূহল বশত চিঠিটি পড়ে সুপ্রকাশ। আর পড়েই বুঝতে পারে সুজাতাদেবীর মনোভাব কতখানি বিরূপ তার প্রতি। এর পর সুপ্রকাশের সঙ্গে সুজাতার দেখা হলে সুপ্রকাশের ভদ্র-মার্জিত চেহারা এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হয় সুজাতা। তারা ঠিক করে নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক থাকবে না। ধীরে ধীরে সুজাতার জীবনে সুপ্রকাশের 'আবির্ভাব'-এর মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সমালোচক সুজাতার কঠোর সমালোচনার জন্যই সুপ্রকাশ নিজের লেখার স্টাইল পাল্টায়। সুজাতার আবির্ভাব-এ

সুপ্রকাশের জীবনে নতুন সূর্যোদয় ঘটে। লেখিকা আশালতা সিংহ সুজাতার মধ্যে সাহিত্যবোধ সম্পন্না একজন শিক্ষিতা, প্রগতিশীল নারীর ছবি এঁকেছেন যে নারী আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী।

'অষ্টমী' — উপন্যাসটি ১৯৪২ সালে কাত্যায়নী বুক স্টল থেকে প্রকাশিত হয়। মোট আটজন লেখক- লেখিকা উপন্যাসটিতে লিখেছেন। এটি একটি বারোয়ারী উপন্যাস। উপন্যাসটিতে পাঁচজন লেখকের লেখা থাকলেও লেখিকা ছিলেন মাত্র দু'জন। যথা — শ্রীমতী রাধারাণী দেবী এবং শ্রীমতী আশালতা সিংহ। আটটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত উপন্যাসটির সপ্তম পরিচ্ছেদটি লেখেন আশালতা।

এই উপন্যাসের নায়িকা রমা। রমা আধুনিকা ব্যক্তিত্বময়ী নারী। রমা ব্রজেনকে ভালোবাসে। যদিও রমা বিবাহিত তবে বিবাহিত জীবন রমার বড়োই দুঃখের। রমার বিয়ের পর তার পিতা এবং শ্বশুরের মতান্তরের কারণে রমাকে পিতৃগৃহেই থাকতে হয়েছে। এমনকি রমার স্বামীর অন্যত্র বিবাহও হয়েছে। স্বামী সঙ্গে বঞ্চিত বিবাহিতা রমা ব্রজেনকে ভালোবাসলেও রক্ষণশীল সমাজ তাদের এ সম্পর্ককে সুনজরে দেখে না। ফলে রমা ও ব্রজেন যশিডিতে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে ঘর বাঁধে। সেখানেও তাদের সত্যিকারের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় তারা যশিডি ছেড়ে কোলকাতায় ফিরে আসে।

রমার কাছে হৃদয়ের সম্পর্ক বড় হলেও যখনই তাদের সম্পর্ক নিয়ে লোকে কটাক্ষ করেছে তখনই কিন্তু রমা আত্মমর্যাদার কথা ভেবে প্রেমাস্পদ ব্রজেনকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এমনকি ব্রজেনকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিয়েছে এই বলে যে — ''আর যেন আমাদের দেখা না হয়।''[১৬]

রমার এই ত্যাগের কথা জানতে পেরে ব্রজেনের পিতাও রমাকে স্নেহ আর্শীবাদ করেন বেং জানান — ''তুমি যে স্বেচ্ছায় তার কল্যাণের জন্য কতখানি ছাড়ালে তা যখন বুঝতে পারি তখন স্নেহের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা না ক'রেও থাকতে পারিনে রমা।'[১৭]

শেষে অবশ্য রমা এবং ব্রজেন মিলিত হতে পেরেছে। তাদের এই সম্পর্ককে চিরস্থায়ী বৈধ রূপ দিতে তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। তবে তাদের এই বিবাহ নিজেদের দেশের মাটিতে সম্ভব হয়নি। এরজন্য তাদের পাড়ি দিয়ে হয়েছে ভিন দেশে — বর্মায়।

'কলেজের মেয়ে' — উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে এভাবে —'কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের' একটি তিন তলা বাড়ির বর্ণনা দিয়ে।

মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্র কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে মেস করে থাকেন। এমনই একটি তিনতলার ঘর ঐ স্ট্রীটে। সন্ধ্যা সাতটায় ঐ তিনতলা বাড়িটির ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠেছে। ঐ বাড়িখানি মেস বাড়ি। ঐ তিনতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলির মধ্যে যেটা বড়, পরিস্কার পরিপাটিভাবে সাজানো, সেটা সুধীরের ঘর, যেখানে চার পাঁচজন যুবক তাস খেলছে। এদের সবারই বয়স তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। এদের মধ্যে অতুল সুধীরকে জিজ্ঞেস করে সে কবে ছুটি নিচ্ছে কারণ আসছে অগ্রহায়ণের পঁচিশে তো সুধীরের বিয়ে। বন্ধুরা জানত না বিষয়টা। তাই কথাটা শুনে সকলেই অবাক হলো। আরও অবাক করার মত কথা হল — সুধীরের নাকি মনে হয় বিয়েতে হৈ চৈ করা উচিত নয়, সেটা নির্জ্জনের বিষয়। বিয়েটা গভীরতম এবং গোপনতম সাধনার বস্তু হলেও এর বাহ্যিক দিকটাও রয়েছে — যেখানে সবাই একসাথে আনন্দ করে, আলো জ্বলে, শানাই বাজে।

যাই হোক পাতলা ছিপছিপে দোহারা চেহারার সুধীর যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখে একটি কমনীয় ভাব সে একটু একান্তে থাকতেই ভালোবাসে। বন্ধুদের হট্টগোল থেকে বেরিয়ে সে যায় বালিগঞ্জে সঙ্গীত সংঘের উদ্বোধনে; সুধীর ডাক্তারির পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে সে যেমন গান করে তেমনি সাঁতার কাটে। সাহিত্যের প্রতিও সে বিশেষ অনুরাগী। এদিকে গানের সভা থেকে মেসে ফিরে দেখে তার হবু সম্বন্ধী নির্ম্মলেন্দু বসে আছে। নির্ম্মলেন্দু সুমিত্রার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়, তাই সুমিত্রা তাকে দাদা বলে।

এদিকে বিয়ের আর দিন দশেক বাকি। বেথুন কলেজে পড়া সুমিত্রা কিন্তু এখনও কলেজে যায়। এ নিয়ে সুমিত্রার পিসিমা, মা আপত্তি জানালেও সুমিত্রা সে কথা কানে তোলেনি। সুমিত্রার পিতা ভুবনবাবু নামকরা প্রফেসর। লেখিকা আশালতার কথায় — 'সাধারণ শিক্ষিত উন্নতিশীল বাঙালী পরিবারের মত মেয়েকে কলেজে পড়িতেও দিয়াছেন, আবার সতের-আঠার বছরের হইতে না হইতে বিবাহের জন্যও খোঁজাখুঁজি করিতেছেন।'[১৮]

সুমিত্রার বন্ধুরা আফসোস করে ভাবে যে বি.এ থার্ড ইয়ার অবধি পড়েও বিবাহের পরে তার হয়তো বি.এ ফাইনাল পরীক্ষাটা দেওয়া হবে না। বাবার মুখে সুমিত্রা শুনেছে তার শ্বশুরবাড়ি আধুনিক তাই সুমিত্রার আশা সে পরীক্ষা দিতে পারবে। সুমিত্রার মা যতই ভাবুন মেয়েদের লেখাপড়া শেখা, ডিগ্রী নেওয়া কেবল সুপাত্র পাবার জন্য, সুমিত্রা এবং তার বান্ধবীদের কিন্তু এ মত মোটেই নয়।

সুমিত্রার যার সাথে বিয়ে হবে সেই সুধীর কোলকাতায় ডাক্তারী পড়লেও তার পৈতৃক বাড়ি পূর্ববঙ্গের একটি ছোট শহরে। সুধীরের বাড়িতে বাতে শয্যাশায়ী মা ছাড়া তার দিদি কাদম্বিনী ছিল। কাদম্বিনী স্বামী সহ বাপের বাড়িতেই থাকত। কারণ তার শ্বশুরবাড়ি ছিল অজ পাড়া গাঁয়ে, সেখানে মশা, ম্যালেরিয়া সহ আরও এমন কিছু থাকে যা ঠিক ভলো লাগে না। অর্থকরী অবস্থাও খুব ভালো ছিল

না তাই কাদম্বিনী স্বামী সহ বাপের বাড়িতেই থাকে।

বিয়ের পর সুমিত্রা যখন শ্বশুরবাড়িতে এল তখন সুমিত্রা দেখল তার ভাবনার সঙ্গে কেমন যেন মিলছে না।

সুধীরকে এক সপ্তাহের মধ্যেই কোলকাতায় ফিরতে হবে। সুমিত্রাও স্বামী সুধীরের সঙ্গে কোলকাতায় যেতে চায়।

জগৎ সংসারে মেয়েদের অবস্থানটা খুব ভালো করেই বুঝতেন আশালতা। তাই দেখা যায়, সুধীরের মা যখন সুমিত্রাকে বলে 'তোমারই সংসার, তোমারই সব'[১৯] তখন মেয়ে কাদম্বিনী ভাবে সমাজ সংসারের নিয়মই এই। বিয়ের পর বাপের বাড়িতে যেন মেয়েদের অধিকার নেই, শ্বশুরবাড়িই সব। তাই কাদম্বিনী মনে মনে বলে 'ছেলেই সব। মেয়ে কেহ নয়।'[২০]

সুমিত্রা বাবার বাড়িতে কলেজে পড়েছে, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে হাসি আড্ডায় সময় কাটিয়েছে, ঘরের কাজ খুব একটা শেখেনি; শ্বশুবাড়িতে এসে কাজকর্ম্ম সে খুব একটা নিপুণভাবে করতে পারে না। এমন কাজের লোকেদেরও সে ঠিকমতো খাটাতে জানে না তার উপরে তার বই পড়ার প্রচণ্ড নেশা ঘরের অনেক কাজই অবহেলিত হয়। এই ছোট খাটো বিষয়গুলো নিয়ে নন্দাই যতীন ঠাট্টা তামাশা করলে শাশুড়ীর সামনে সুমিত্রাও নন্দাই যতীনকে কিছু কড়া কথা বলে। জামাইকে অপমানিত হতে দেখে শাশুড়ী মনোরমাও অত্যন্ত চটে যান এবং সুমিত্রাকে কোলকাতায় চলে যাবার নির্দেশ দেন।

সুমিত্রাও স্বামী সুধীরকে চিঠি লেখে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। যতীন সুধীরকে এ ব্যাপরে বোঝাতে এলে সে বলে —

> ''মেয়ে মানুষ যে চিরকাল উৎপীড়িত হয়ে আসাব এবং চোখ মুখবুজে নির্বিচারে সব সহ্য করবে — এমন বিধির কোনই মানে হয় না। চিরদিন ধরে একটা নিয়ম চলে এসেছে বলেই যে সে নিয়মটা অত্যন্ত চমৎকার — একথা অনেকে একসঙ্গে মিলে তারস্বরে ঘোষণা করলেও সেটা সত্য হয়ে ওঠে না।''[২১]

সুমিত্রাকে নিয়ে সুধীর কোলকাতায় এসে সুমিত্রাকে তার পিতৃগৃহে রেখে সে হোস্টেলে চলে যায়। কোন খবর না দিয়ে মেয়েকে এভাবে হঠাৎ আসতে দেখে মা বিরজা দেবী খুবই অবাক হন। এখানে এসে সুমিত্রা পুনরায় কলেজে ভর্তি হয়, তার স্বামী সুধীরই সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। সুমিত্রার দু একজন বান্ধবীরও বিয়ে হয়ে গেছে। সুমিত্রার এক বান্ধবী দীপার বিয়ে হয় এক প্রফেসরের সঙ্গে। ভবানীপুরেই তারা থাকে। সুমিত্রা তার স্বামীকে নিয়ে একদিন দীপার নতুন সংসার দেখতে গেল। দীপা

বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে খুবই আদরে দিন কাটালেও বিয়ের পর অল্প আয়ের সংসারে সুনিপুণভাবে সে সংসার চালাচ্ছে। সুমিত্রা এসব দেখে অবাক হয় শুধু তাই নয় ছোট্ট সংসারে দীপার নিপুণ হস্তের সেবা পরায়ণা রূপ তাকে মুগ্ধ করে। সুমিত্রার স্বামী সুধীরও বলে —

> '... মেয়েমানুষকে আর যে কোন অবস্থায় দেখি, তাকে গৃহকাজের মাঝে যত একান্ত সত্য এবং সার্থকভাবে দেখা যায়, এমন আর কিছুতেই নয়!''[২২]

আজকাল মাঝে মাঝে সুধীরের মনে হয় তার স্ত্রী সুমিত্রা বড় বেশি আত্মপরায়ণ। কিন্তু সুধীরের স্বাভাবই এমন যে সে স্ত্রীকে কোন কিছু জোর করে করাতে চায় না। সুধীরের বোন কাদম্বিনীও ভাবে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুমিত্রা দূরে চলে গিয়ে সব কিছুকে আরও জটিল করে দিয়েছে। এতে সবাই কষ্ট পাচ্ছে। কাদম্বিনী দাদা সুধীরকে চিঠি লেখে মায়ের অসুস্থতার জন্য, সুধীর যেন মাকে কোলকাতায় এনে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

সুমিত্রাকেও কাদম্বিনী চিঠি লিখে জানায় যে তার সংসারের যে শূন্যতা তা কেবল সুমিত্রাই পূরণ করতে পারে কাজেই সে যেন এসে নিজের সংসার গুছিয়ে নেয়।

সুমিত্রার দিদি এলাহাবাদ থেকে বেশ কয়েকবছর পর বাপের বাড়ি কোলকাতায় এসেছেন। দিদি উর্ম্মিলার সঙ্গে মেয়ে প্রতিমাও এসেছে, প্রতিমার বিয়ে দেবার জন্য, উর্ম্মিলা পাত্র খুঁজছে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে সেই ভাবনাতে প্রাচীনপন্থী উর্ম্মিলা ছোট থেকে যেভাবেই মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি মেয়েকে চা পান করতেও দেননি, যদি এমন শ্বশুরবাড়িতে বিয়ে হয় যে তাদের ঐ চা-পান এর কোন রেওয়াজ নেই — এ ব্যাপারে সুমিত্রা প্রতিবাদ করে দিদি উর্ম্মিলাকে বলেন যে এত সব ভাবনা বিয়ের আগে থেকে না ভাবলেও চলে। সে বলে — ''কবে কোন্‌কালে তার বিয়ে হবে, আর সে শ্বশুরবাড়ী যাবে এই কথাটি মনে রেখে তাকে এখন থেকেই এটা করতে নেই ওটা খেতে নেই ... এমনি হাজার অনুশাসন বাঁধবার কি দরকার? আমার কাছে এটা খুবই অন্যায় মনে হয়।'[২৩]

সুধীরের মা সহ বাড়ির সকলকে সুধীর কলকাতায় বাসা ভাড়া করলে সুমিত্রার দিদি উর্ম্মিলা বোনকে বলে যে এখন তার অসুস্থ শাশুড়ীর সেবা করা উচিত। সুমিত্রা তার কলেজে পরীক্ষার কথা বললেও উর্ম্মিলা মৃদুস্বরে বলে — 'সুমিত্রা তুই কি বলছিল বুঝতে পারছিস নে। পরীক্ষা দেওয়া হোক বা নাই হোক তাতে কি যায় আসে? যাঁকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসিস তাঁর মা'র অসুখে প্রাণ ভরে সেবা করবিনে?'[২৪] দিদির কথা শুনে সুমিত্রার স্বাধীন আত্মপরায়ণ ব্যক্তি সত্ত্বাও টলতে লাগল।

মনে যাই ভাবুক সুমিত্রা বাড়ির গাড়িতে ড্রাইভারের সঙ্গে নিজেই তাড়াতাড়ি স্বামীর ভাড়া করা বাড়িতে শাশুড়িকে দেখতে এলেন। সুমিত্রার আসাতে সকলেই খুবই খুশি। শাশুড়িকে দেখে সুমিত্রা

হয়তো ফিরে যাবে — এটা সুমিত্রা যেমন ঠিক করেছিল সুমিত্রার শাশুড়িও তাই ভেবেছিল। শেষ মুহূর্তে অবশ্য শ্বশুরবাড়িতে থেকে যাওয়াই ঠিক হবে ভেবে সুমিত্রা আর বাপের বাড়ি ফিরল না।

উপন্যাসের শেষে দেখি সুমিত্রা নিজেই শ্বাশুড়ীর সেবা যত্ন এবং শ্বশুরবাড়ির অন্য সকলের দেখা-শেনার জন্য কলকাতায় ভাড়া করা শ্বশুবাড়িতেই থেকে গেল। সুমিত্রার মা, দিদি উর্ম্মিলা এরাও নানাভাবে সুমিত্রাকে বোঝায় যে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির সকলের মন যুগিয়ে সংসারের সেবা করাই মেয়েদের জীবনের পরম সার্থকতা; এছাড়া বান্ধবী দীপাও যেন সুমিত্রার সামনে একটা জীবন্ত উদাহরণ; বাপের বাড়িতে আদরে যত্নে কাল কাটালেও বিয়ের পর স্বামীর আদর যত্ন করাই যেন মেয়েদের কর্তব্য। সুমিত্রার আশপাশের আত্মীয় বন্ধু সকলেই সুমিত্রাকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কোলকাতায় ভাড়া করা বাড়ীতে শাশুড়ীর সেবা করেও সুমিত্রা এরপর বি.এ পরীক্ষা দেবে কিনা বা তার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে কিনা সে তথ্য লেখিকা আশালতা পাঠককে দিচ্ছেন না। কিন্তু এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এরপর থেকে সুমিত্রা স্বামী-সংসারের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়েই কর্তব্য কর্ম করবে আর তাতে যদি তার কলেজের শেষ পরীক্ষা দেওয়া না-ও হয় তবুও আফসোস করবার কিছু নেই। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসারও সেটাই চায়।

‘একাকী উপন্যাস’ — প্রথমে ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪২ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে ১৩৪৭ সালে ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসটির শুরুতেই দেখি নরেনকে, যে মধ্যবিত্ত ঘরের ছা-পোষা ভদ্রলোক যিনি বারো মাস ত্রিশ দিন রোজ নটায় ভাত খেয়ে পাঁচটা অবধি আপিস করে।

নরেনের স্ত্রী আছেন। নরেনের দুটি মেয়ে — কল্যাণী এবং গৌরী।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে নরেনের দুই মেয়ে যেভাবে মানুষ হচ্ছে নরেনের বন্ধু শচীশের মেয়ে প্রতিভা কিন্তু সেভাবে মানুষ হচ্ছে না। শচীশের আয় অনেক বেশি তাই প্রতিভাও অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে মানুষ হচ্ছে শুধু তাই নয় শচীশ বলে —

> ‘‘বুটলিকে আমি এখন থেকেই সেতার শেখাতে আর গান শেখাতে লোক রেখেচি। ওর দাদার সঙ্গে ও সমান ভাবে মানুষ হচ্ছে।’’[২৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিভার ডাক নাম বুট্‌লি। শচীশ মেয়েকে আদরে যত্নে ছেলের সঙ্গে একইভাবে মানুষ

করলেও শচীশের স্ত্রী ক্ষণপ্রভার এতে মত ছিল না। প্রাচীন ভাবধারায় বিশ্বাসী ক্ষণপ্রভার সদা সর্বদা আশঙ্কা হত মেয়ে এত স্বাধীনভাবে মানুষ হলে পরবর্তীকালে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারবে কিনা।

এবারের গরমে শচীশের পরিবার সহ দার্জিলিং-এ যাবার কথা। দাদা কল্যাণের মতো প্রতিভাও চায় দার্জিলিংএ গিয়ে ঘোড়ায় চড়া শিখবে। শচীশের এ বিষয়ে পুরো সম্মতি রয়েছে। মেয়েদের জন্য শচীশের এই যে দরদ, স্নেহ-মমতা এর পেছনে একটা ইতিহাস ছিল। শচীশের মা বিয়ের আগে গান শিখেছিলেন, কিন্তু বিয়ের পর তার গানের চর্চা একেবারেই ছিল না এমনকি মামার বাড়িতে গিয়েও শচীশের মা যদি কারও অনুরোধে গান করতেন আর তা যদি তার স্বামী কোনওভাবে জানতে পারত তা হলে আর রক্ষে থাকত না। শচীশ তাঁর মার সম্বন্ধে বলে —

> ''কোন বিষয়ে কথা উঠলেই তাকে বলতে শুনেচি, কর্ত্তা এখন বাড়ী নেই। তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞেস করে যা হয় হবে। এমন একটা লোক দেখানো গৃহিণীত্বের প্রয়োজনটা কোন্‌খানে?''[২৬]

শচীশের এই ক্ষোভের উত্তরে ক্ষণপ্রভা স্বামীকে বোঝায় যে 'আমরা হিন্দু মেয়েরা ছোট থেকে স্বামীর অস্তিত্বের সঙ্গে নিজেকে এবং স্বামীর সংসারের সঙ্গেই নিজের যা কিছুকে এক করে দেখতে শিখি। এ যদি না শিখতুম তাহলে হয়তো পদে পদে বাধতো।''[২৭]

লক্ষণীয় বিষয় হল, লেখিকা শ্রীমতী আশালতা সিংহ পুরুষ শচীশের মুখ দিয়ে নারীর ব্যক্তিত্ব, সমাজে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদেরও সমমর্যাদা প্রাপ্তি এ ধরনের কথা বললেও ক্ষণপ্রভার মতো মহিলার মুখ দিয়ে কিন্তু স্বামী-সংসারের সেবা করাই মেয়েদের ধর্ম — এ ধরনের মতামত দিয়েছেন। কারণ আশালতা জানতেন কোন মেয়ে তাদের দাবি দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া নিয়ে সোচ্চার হলে সমাজপতিরা মোটেই তাকে এবং তার স্রষ্টাকে রেয়াৎ দেবে না।

এদিকে শচীশের বন্ধু নরেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। তার পরিবারের ওপর নেমে আসে ভয়ানক দূরবস্থা। নরেনের বড় মেয়ে গৌরী মাত্র এগারো বছরের হলেও বয়সের চেয়ে অনেক বেশি সে পরিণত।

শচীশের স্ত্রী ক্ষণপ্রভা মেয়ে প্রতিভাকে সামাজিক রীতি নিয়ম শেখাতে উদ্‌গ্রীব হয় বিশেষত তিনি জানেন মেয়েকে পরের বাড়িতে গিয়ে সংসার করতে হবে। তিনি মেয়েকে বলেন — ''মেয়েদের সেই কবে কোন্ যুগ থেকে কত এটি-সেটি করে মন যুগিয়ে চলতে হয়েছে। তার জন্য দরকার কত সেবা, কত ধৈর্য্য, কত সহিষ্ণুতা।''[২৮]

কিন্তু যতদিন যাচ্ছে প্রতিভার মনোভাব তার সমাজ পারিপার্শ্বের প্রতি ততই বিরূপ হয়ে ওঠে।

প্রতিভার পিতা প্রতিভাকে ছোট থেকেই যে তার মধ্যে যে আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন তার ফলে আজ আর সে সাধারণ মেয়ের মত সকলের সঙ্গে সাধারণ ভাবে মিলতে পারে না।

তরুণ ব্যারিস্টার অজিত কে ক্ষণপ্রভা তার মেয়ে প্রতিভার জন্যে অনেকদিন থেকে মনোনীত করে রেখেছেন। অজিতেরও প্রতিভাকে খুবই পছন্দ। কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিভার মতটি কী তা পরিস্কার করে অজিত বুঝতে পারছে না। তাই পার্টিতে একদিন যখন প্রতিভার সঙ্গে অজিতের দেখা হয় সেদিন সুযোগমত একান্তে অজিত প্রতিভার মত জানতে চাইলে প্রতিভা বলে — 'স্ত্রীকে তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য সমেত কাউকে শেষ অবধি স্বীকার করে নিতে।''[২৯] প্রতিভার মতে — 'সংসারের অধিকাংশ লোকেই এইরূপ হয় বাইরেকার রূপটাই তাহাদের চোখে পড়ে। ভিতরের কথা তলাইয়া বুঝিবার মত না থাকে ধৈর্য্য, না থাকে প্রবৃত্তি।''[৩০]

প্রতিভা তাই মায়ের মনোনীত পাত্র অজিতকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়। অজিত যে ভদ্র, মধুরভাষী এবং প্রতিভাকে যে সে কোনদিন দুঃখ দেবে না এ বিশ্বাসও প্রতিভার ছিল।

অজিত এবং প্রতিভার ডিসেম্বর মাসে বিবাহ হল। বিয়ের পর তারা পাহাড়ী অঞ্চলে ঘুরতে যায়। প্রতিভা নব-পরিণীতা হলেও গৃহের প্রায় সব কাজই সে নিজে করতে পছন্দ করে। তাই ঘুরতে যাবার সময় ঝি-চাকরকে সঙ্গে নেবার যে প্রস্তাব স্বামী অজিত করেছিল তাতে সে রাজি হয় না। গৃহকর্মরত প্রতিভার দিকে তাকিয়ে আজিতও ভাবে - ''রমণীর সৌন্দর্য গৃহকর্ম্মে যেমন ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নহে।''[৩১]

বিবাহের এক বছর পর থেকেই অজিত নিজের ব্যারিস্টারির কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, স্ত্রীকে যে সে একেবারে সময় দেয় না তা নয় তবে শুধু ঘরের কাজ কিংবা শুধু-বিভিন্ন অনুষ্ঠান পার্টিতে ঘুরে ঘুরে প্রতিভার 'একটা হৃদয় ভারাক্রান্ত ক্লান্তি যেন বার বার মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়।'[৩২] প্রতিভা কেবলই ভাবে তার মা কী করে সহজেই তার জীবনের চারদিকে স্বামী-সংসার-ছেলে-মেয়ে আত্মীয় প্রতিবেশী সকলকে বেধে ফেলেছেন। কোথাও তার মায়ের জীবনে কোন ফাঁক নেই ক্লান্তি নেই। তবে প্রতিভা কেন পারছে না? তখন প্রতিভার তার মায়ের সাবধান বাণী মনে পড়ে — ''... তোর বাপের এই শিক্ষায় জীবনে তুই সুখী হবি কেমন করে?''[৩৩] তাহলে হয়তো প্রতিভার মায়ের অনুমানই ঠিক — প্রতিভার শিক্ষায় এমন কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে যাতে সে সংসারে সুখী হতে পারছে না।

প্রতিভা ক্লান্ত হয়ে বিলেতে পড়তে যাওয়া দাদা কল্যাণকে চিঠি লেখে তার ব্যথাতুর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা জানিয়ে। কল্যাণ এর উত্তরে জানায় —

'' তোমার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ শিশুকাল হইতে পুরুষের মত করিয়া গড়িয়া

> উঠিয়াছে। ইহাতে করিয়া অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মত নিজেকে লুপ্ত করিয়া দিয়া প্রেমের ভিতর দিয়া আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়া দিতে তোমার বাধিতেছে।''[৩৪]

অর্থাৎ প্রতিভার মায়ের মতো তার দাদা কল্যাণও বিশ্বাস করে মেয়েদের সাংসারিক কাজে ছোট থেকেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। স্বাধীন চিন্তা ভাবনা করবার মত যথেষ্ট শিক্ষা মেয়েদের পাওয়া উচিত নয় বলেই সকলের ধারণা। স্বাধীন চিন্তা ভাবনায় ভাবিত হয়ে মৌলিক কাজ করার অধিকার যেন একমাত্র পুরুষেরই।

দাদার পরামর্শ, মায়ের কথা স্মরণ করে প্রতিভা ভাবে —

> '.... হায় রে সংসার! আর তাহার শত লক্ষ দাবী-দওয়া। এই সব গল্প, এই সব সঙ্গ, এই পরিবেশের মাঝে অহরহ তাহাকে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ভালো লাগে না ভালা লাগে না-এমন কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিবারও জো নাই।'[৩৫]

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে গড়া প্রতিভার চরিত্রের পাশে নরেনের বড়মেয়ে গৌরী চরিত্রের বৈপরীত্যকে তুলে ধরে লেখিকা আশালতা সিংহ দেখিয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসার মেয়েদের কাছে কীভাবে বলি নেয়। মেয়েরা কীভাবে তিলে তিলে তাদের নিঃশেষিত করে দেয়।

গৌরীর একান্নবর্তী পরিবারে দোজবরে বিবাহ হয়েছে। গৌরীর বয়স সতেরো হলেও তার বরের বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। গৌরীর স্বামীর আগের পক্ষের দুটি ছেলেমেয়েও আছে। সংসারের ঘানি টানতে টানতে গৌরীর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। গৌরীর শ্বশরবাড়ি গ্রামে হলেও তার স্বামী কোলকাতায় চাকুরী করে। বিয়ের পর গ্রামে থাকলেও কয়েক বছর পর গৌরীরা জা-ভাশুর-সহ কোলকাতায় চলে আসে। শহরে এসেও গৌরীর সাংসারিক কাজকর্মের চাপ এতটুকু কমে না। শহরে যে বাড়ীতে গৌরীরা থাকে তার পাশে প্রতিভার বাপের বাড়ি। প্রতিভা সন্তান সম্ভবা হলে প্রতিভার মা ক্ষণপ্রভা দেবী মেয়েকে কিছুদিন তার বাড়িতে এনে রাখেন। বাপের বাড়িতে এসে প্রতিভার পাশের বাড়ির গৌরীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়। দুপুরে মাঝে মধ্যে গৌরী প্রতিভার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসারের কাজে জুড়ে থাকা গৌরীর কি কখনো ক্লান্ত লাগে না — এ প্রশ্ন গৌরীকে করলে সে প্রতিভাকে জানায় —

> 'আমি তো তোমাদের মত বেশি লেখাপড়া শিখিনি, হয়তো মনের ও সব সূক্ষ্মভাব সহজে আমার মনে প্রবেশ করে না। এইটুকু বুঝি, কাজ তো আমি

দায়ে পড়ে করিনে। সবারই সুখ-সুবিধে আনান্দ হলে মনে কেমন একটা তৃপ্তি আসে।'[৩৬]

অর্থাৎ ছোট থেকেই শুধু সংসারের সকলকে সেবা করতে হবে বিশেষত স্বামী শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে — এ বোধ তথা সংস্কার গৌরীর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। সন্তানসম্ভবা প্রতিভা দুপুরবেলায় সময় কাটাতে বই পড়ে। আজকাল প্রতিভা ইংরেজী-রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই বেশি করে পড়ছে। এরমধ্যে একদিন হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী বইটি প্রতিভার হাতে আসে। সেখানে প্রফুল্ল চরিত্রের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলাচ্ছেন — '.... রাজত্ব স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম এই সংসার ধর্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।'[৩৭]

' দেবী চৌধুরানীর' প্রফুল্লর এই দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তথা শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ব্যবহার করছেন। আপামর বাঙ্গালী পাঠক এই ধরনের লেখাই শ্রদ্ধা সহকারে এতদিন পাঠ করেছেন। কারণ এমন মেয়েই তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চায় যে নিজের জন্য কোন কিছু না রেখে সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে দাসীগিরি করেই সর্বসুখ অনুভব করে। বঙ্কিমের সৃষ্ট প্রফুল্ল চরিত্রের সঙ্গে গৌরী চরিত্রের অদ্ভুত মিল খুঁজে পেল প্রতিভা।

এসব দেখে শুনে প্রতিভা ভাবে এখন থেকে সে নিজেকে নিয়ে আর বেশি ভাববে না। তার গর্ভে যে সন্তান আছে যে আর কিছুদিন পরেই ভূমিষ্ঠহবে তাকে নিয়েই, তাকে আঁকড়ে ধরেই এখন থেকে সে বাঁচবে।

বৌদি কল্যাণীও প্রতিভাকে বলে সাধারণ জিনিষ থেকে আনন্দ নিতে সে শেখেনি, কঠিন কোন কাজেই প্রতিভা আনন্দ পেতে চায় কিন্তু এসব জিনিষ পুরুষকে মানালেও মেয়েদের মোটেই তা মানায় না। অন্তত সমাজ তা মেনে নেয় না। প্রতিভা তো সাধারণের মতো মানুষ হয়নি কাজেই তাকে এখন সাধারণ সংসারের সকল কিছুতে জুড়তে চাইলে সে তো কিছুতেই জুড়বে না। প্রতিভা তাই কল্যাণীর সামনেই বলে —

''নিজের মধ্যেই কেবল আত্মসমাহিত হয়ে নিমগ্ন থাকা পুরুষের পক্ষে ঐশ্বর্য হতে পারে; কিন্তু স্ত্রীলোকের ঐশ্বর্য তা নয়।''[৩৮]

ধীরে ধীরে প্রতিভার মধ্যে মেয়েলি সংস্কারগুলো ঢুকতে থাকে। এখন সে আর বেশি পড়ে না বরং সেলাই করে। নব জাতকের আগমনের কথা ভাবে। আশ্বিন মাসের শেষে প্রতিভার এক কন্যা সন্তান হল।

সন্তানকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর স্নেহ-ভাবনা-উদ্বেগ একই জায়গায় মিলে গেছে। আশালতার

কথায় —

> '' তাহাদের দুইজনের মিলিত জীবনে এতদিন যত ফাঁক, যত শূন্যতার অবকাশ ছিল, আজ এই বিন্দুতে আসিয়া সে সমস্তই মিলিয়া গেল, তাহাদের মিলনের গ্রন্থি আজ গাঁথা হইল।''[৩৯]

ধীরে ধীরে প্রতিভার মেয়ে মাধবী বড় হচ্ছে। মাধবীকে ঘিরেই প্রতিভার বহু সময় কাটতে লাগল। মাধবীর প্রাথমিক পড়াশুনা প্রতিভার কাছেই শুরু হল।

কীভবে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে প্রতিভা মেয়েকে বড় করে তুলবে — এ নিয়ে দাদা কল্যাণের সঙ্গে আলোচনা করলে কল্যাণ জানায় নিজেকে দান করতে পারার শিক্ষা যেন খুকি পায়। কারণ কল্যাণের মতে যেহেতু মেয়েরা স্বামী সংসারের নানা জনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে বাধ্য হয় তাই ছেলেদের চাইতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ঢের শক্ত। ছেলেদের তো আর মানিয়ে চলার বালাই নেই।

আপাতদৃষ্টিতে তাই যতই মনে হোক না কেন লেখিকা আশালতা মেয়েদের নিজেদের সর্বোতভাবে দাসী করার মধ্যেই গৌরব ভাবেন প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। নইলে কল্যাণের চরিত্রের ঐ ধরনের সংলাপ —

> ''কেবল এইটুকু বলতে পারি, যাই শেখাস তার সঙ্গে এমন কিছু শেখাস যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে তার স্বামী তার ছেলের জীবনকে নিজেকে সর্বতোভাবে দান করার মধ্য দিয়ে সে চরম মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে।''[৪০]

নরেনের মেয়ে গৌরী মাত্র তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন।

সকলেই বলাবলি করতে লাগল অতিরিক্ত, পরিশ্রমে তার শরীর ভেতরে ভেতরে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। কারণ 'সারাটি দিন সবারই জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটত।'[৪১]

নরেনের মেয়ে গৌরী মাত্র তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন। সকলেই বলাবলি করতে লাগল অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার শরীর ভেতরে ভেতরে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। কারণ 'সারাটা দিন সবারই জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটত।'[৪২]

অনেকে আবার গৌরীর সৌভাগ্যের জয় ঘোষণা করতে বলতে লাগল '... আহা এমন ভাগ্যিমানী ছিল গো। স্বামী-পুত্র, দেওর ভাশুর সবাইকে রেখে ঢেকে, কারও সেবা না নিয়ে এমন করে যাওয়া কত ভাগ্যের।'[৪৩]

প্রতিভা ভাবতে লাগল গৌরী যে কিনা অদর্শ গৃহিণী তথা ভাগ্যবতী বলে অনেকে তাকে উল্লেখ করেছে সে যে এমন নিঃশব্দে আত্মবিসর্জনের দ্বারা পৃথিবী থেকে অকালে চলে গেল এতে কার ক্ষতি হলো?

এ প্রশ্ন যেন স্বয়ং লেখিকা আশালতারও। মেয়েদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী? এভাবে গৌরীর মতো সংসারে স্বামী, শ্বশুর বাড়ির লোকজন তথা আত্মীয়বর্গের সকলের সুখ সুবিধার জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সংসারের সকলের সেবায় নিয়োজিত হওয়া? নিজেকে বিস্মৃত হয়ে প্রতিভাও গৌরীর মত সংসারের সকল কাজে নিজেকে অর্পণ করতে চায়। এখানেই উপন্যাসটির সমাপ্তি।

'ভুলের ফসল' — আশালতা সিংহের লেখা উপন্যাস 'ভুলের ফসল' প্রথমে' উত্তরা' পত্রিকায় বড় গল্পের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫০-১৩৫১ সালে। উপন্যাস আকারে ১৩৫২ সালে ভুলের ফসল প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে বাঙ্গালী উচ্চবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যুবক রঞ্জন। ধনী পরিবারের ছেলে রঞ্জন তার সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে জনহিতর কাজে নিজেকে ব্রতী করেছে রঞ্জন।

মাতৃবিয়োগের পর পিতার সঙ্গে রঞ্জনের স্বাভাবিক সম্পর্কটুকুও হারিয়ে গেছে। সে ঘরের প্রতি কোন আকর্ষণই অনুভব করে না। রঞ্জনের পিতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করলে রঞ্জন ঘর ছেড়ে চলে যায় পশ্চিমের এক শহরে। সেখানে রঞ্জন শিক্ষকতার চাকুরী নেয়। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে রঞ্জন নিজের লক্ষ্যস্থল খুঁজে পায়। রঞ্জনের ভালোবাসার পাত্রী বিদ্যুৎ ও রঞ্জনের জীবন থেকে দূরে চলে যায়। রঞ্জনের পিতা রঞ্জনের নামে কোন উইল না রাখাতে বিদ্যুতের মা মালতীদেবী রঞ্জনের সঙ্গে বিদ্যুতের মেলামেশা বন্ধ করে দেন।

বিদ্যুৎ ধনী ঘরের স্বাধীনচেতা মেয়ে হলেও মায়ের অমতে রঞ্জনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। এই উপন্যাসে সন্ধ্যা নামের একটি মেয়েকেও পাই যে গ্রামে তার ছোটবেলা কাটিয়েছে; কৈশোরেই তার পল্লীগ্রামে বিয়ে হয়। আবার স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ কিশোরী মেয়েটি পিতার আশ্রয়েই ফিরে আসে। গ্রামের জমি-জায়গা বিক্রি করে সন্ধ্যা ও তাঁর পিতা কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। সন্ধ্যা ইকনমিক্সে এবং ইংরেজীতে দুবার এম.এ পাশ করেছে। পিতৃবিয়োগের পর সন্ধ্যা রঞ্জনের পিতা যোগেশবাবুর সান্নিধ্যে এসেছে। যোগেশবাবুর প্রতি সন্ধ্যার শ্রদ্ধাপূর্ণ ভলোবাসা ছিল যার জন্য সন্ধ্যা যোগেশবাবুকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু যখনই শুনেছে রঞ্জন তারই জন্য গৃহত্যাগ করেছে তখনই সে রঞ্জনকে পত্র লিখেছে —

''তুমি যদি গৃহে ফিরিয়া না আস তবে তোমাদের গৃহে যাইবার বাসনা আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।''[৪৪]

রঞ্জনও সন্ধ্যার উদারতায় তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছে এবং সন্ধ্যার পরামর্শে দেশ সেবায় নিজেকে ব্রতী করেছে। রঞ্জন সংকল্প করে যে —

''আজ থেকে নিজেকে ভুলে গিয়ে সাধারণ নরনারীর যতটুকু উপকার করতে পারি, যেটুকু কাজে আসতে পারি — সেই চেষ্টাই করব।[৪৫]

দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে রঞ্জন বিলেত যাবার প্রলোভনকে কাটিয়ে ওঠে। প্রমোদবাবুর মত সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক তার বড় মেয়ে শান্তিকে রঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। কিন্তু রঞ্জন যে পথ বেছে নিয়েছে সেখানে ঘর সংসারের মোহ তাকে আটকে রাখতে পারে না; রঞ্জনের পথ ভিন্ন।

'এখন থেকে নিজের প্রয়োজন, নিজের দাবী, নিজের মতামত যতদূর সম্ভব কমিয়ে এনে, এতবড় দুনিয়ার চারিদিকে চাইতে শিখিব।'[৪৬]

গ্রাম জীবনের ছাপ রয়েছে এমন উপন্যাস

‘মুক্তি’ —

লেখিকা আশালতা সিংহ তাঁর ‘মুক্তি’ উপন্যাসটি শুরুই করেছেন নির্ম্মলার নাম নিয়ে। নির্ম্মলার বাবা চন্দ্রকান্ত বাবু ব্রাহ্ম না হলেও ব্রাহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনা করতেন। কোন পূজা-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পেলেও যেতেন না এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বেশিরভাগ বন্ধুরাই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।

এই চন্দ্রকান্তবাবু যখন নির্ম্মলার মা সুশীলার সঙ্গে বিয়ে হয় তখন তিনি রিপন কলেজে বি.এ পড়ছিলেন, স্ত্রী সুশীলার বয়সও ছিল দশ এগারো বছর কিন্তু পল্লীগ্রামের মেয়ে হিসাবে সুশীলা, পূজা উপবাস বার ব্রত যেমন করতে শিখেছিল তেমনি কম খরচে কীভাবে ধৈর্য সহকারে সংসার চালাতে হয় সে শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন।

পড়া শেষ করার পরও চন্দ্রকান্ত খুব একটা বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন সংসারী মানুষ হতে পারলেন না। সুশীলা সংসার ছেলে পুলে নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে চন্দ্রকান্তর উদাসীনতাকে সে তেমন আমল দিল না। সে নিজের ভাগ্যের ওপরই সমস্তটা ছেড়ে দিল।

চন্দ্রকান্তের কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল প্রচুর বই পড়া, সে তাঁর বন্ধুদের ঘরে ডেকে এনে আড্ডা জমাতেন বিনা কারণে মাঝে মাঝে তিনি ঘুরতেও যেতেন। প্রথমে সে একটি বেসরকারী কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন, ভাল না লাগায় সেটাও ছেড়ে দেন। এরপর আর চাকুরি করেননি অথচ চেষ্টা করলেই অন্য চাকুরী জুটিয়ে নিতে পারতেন। একটি দোতলা ছোট পৈতৃক বাড়ি ছিল এবং ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা। সেই টাকার সুদে সংসারের খরচ চলত, যখনই চন্দ্রকান্তের খেয়াল হত কিংবা বেশি টাকার প্রয়োজন হত তখন তিনি ব্যাঙ্ক থেকে চেক কেটে আসল টাকা বের করতেন। সংসারের ভবিষ্যত ভাবনা-চিন্তা, কোন দায়িত্ববোধ তার কোন কালেই ছিল না।

তিন ছেলের পর চন্দ্রকান্তের মেয়ে নির্ম্মলা যখন জন্মালো এবং ধীরে ধীরে যখন একটু বড় হল তখন পিতা চন্দ্রকান্ত যেন মেয়ের দিকে ভালো করে তাকালেন। একদা তিনি সংসারে থেকেও একা ছিলেন এবার মেয়েকে ছাড়া তাঁর একদন্ডও যেন কাটতে চাইল না। নির্ম্মলাকে লেখাপড়া শিখিয়ে চন্দ্রকান্তই বড় করে তুললেন। নির্ম্মলার বয়স যখন সতেরো সে তখন বেথুন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। যদিও নির্ম্মলা বাবার কাছে যেমন প্রশ্রয় পেত মায়ের কাছে তেমনি একেবারেই আমল পেত না। এদিকে সংসার বড় হওয়ায়, খরচ পাতি বেড়ে যাওয়ায় ব্যাঙ্কের মজুদ টাকায় হাত পড়ায় ব্যাঙ্কের সুদ

কমে আসায় সুশীলা দেবী বড় ছেলে সুধাংশুকে বকুলবাগানের দত্তবাড়ির নামকরা উকিলের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। সুশীলাদেবী মতে — ''আশা আছে ল' পাশ করিতে পারিলে শ্বশুরকে মুরব্বি ধরিয়া সুধাংশুনিজের পথ করিয়া লইবে।''[৪৭]

নির্ম্মলার প্রায়ই মনে হয় তার বাবা বড্ড একা। সংসারে কেউ তার বাবাকে বুঝল না। মায়ের সঙ্গে তার বাবার যেন বিস্তর ব্যবধান।

চন্দ্রকান্তের বাইরের ঘরে যারাই আসত তাদের সকলকেই তিনি মেয়ে নির্ম্মলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। ছোট থেকে বাবার কাছে থেকে বাইরের অপরিচিত পুরুষদের সংস্পর্শে সে এমনই অভ্যস্ত হয়েছেন যে এতে অযথা তার কোন সঙ্কোচ হয় না। এমনই একদিন চন্দ্রকান্তর সঙ্গে যামিনী নামে একজন এসে তর্ক আলোচনা জুড়ে দেয়। যামিনী বাইশ তেইশ বছরের যুবক, চন্দ্রকান্তর মেয়ে নির্ম্মলার সঙ্গে যামিনীর পরিচয় করিয়ে দিলে যামিনী বিস্ময়, মুগ্ধতা-সম্ভ্রমের চোখে নির্ম্মলের দিকে তাকায়।

আশালতার প্রায় বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসের নায়করাই মুগ্ধতার সাথে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে নায়িকাদের পানে চায়। শুধু বইপড়া, সেতার বাজানো এসব নিয়ে নির্ম্মলা এমন বিভোর থাকত যে সাংসারিক সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া এসব নিয়ে সে তেমন মাথা ঘামাত না। আশালতার কথায় — 'তাহার সপ্তদশ বর্ষের জীবনে সে কখনও বাংলা বা ইংরেজী নভেল পড়ে নাই, লুকাইয়া আড়ি পাতে নাই, পান চিবাইতে চিবাইতে কিংবা চকোলেট চুষিতে চুষিতে সমবয়স্কদের সহিত সরল আলোচনা করে নাই। এখনও তাহার তরুণ জীবনের মধ্যে আত্মনিমগ্ন একা।'[৪৮]

যামিনীর চঞ্চল স্বভাবের জন্য সে কখনো ধৈর্য ধরতে শেখেনি। রূপসী, বিদুষী, সরল স্বভাবের নির্ম্মলাকে নিজের করে পেতে আগ্রহী যামিনী নির্ম্মলার মতামত জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। যামিনীর এ ধরনের ব্যবহার নির্ম্মলা যখন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না তখন যামিনী নির্ম্মলার পিতা চন্দ্রকান্তবাবুকে প্রস্তাব দেয় নির্ম্মলাকে বিবাহের জন্য। যামিনীর পিতা-মাতার মতামত সম্বন্ধে চন্দ্রকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলে যামিনী জানায় তার পিতা মাতাকে সে যে করেই হোক রাজি করাবে। যামিনীর দাদা নির্ম্মলাকে দেখে পছন্দ করলেও যামিনীর মায়ের ছ-সাত হাজার টাকার গহনার দাবির কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

এদিকে যামিনী চন্দ্রকান্তবাবুর পরিচিত আশুবাবুর মুখে চন্দ্রকান্তবাবুর অবস্থার কথা শোনে, শোনে তার টাকাকড়ি খুবই কম। ছেলেরা টিউশুনি করে পড়ার খরচ চালায়। মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি তিন হাজার টাকা আশুবাবুর কাছে ধার করেছেন। এসব শুনে যামিনী তার নামে দশ হাজার টাকার পোস্টাল সার্টিফিকেট ভাঙি য়ে ফেলে। সেই টাকা দিয়ে গহনা-শাড়ি কিনে এনে নির্ম্মলাদের বাড়িতে

এসে দিয়ে যায়।

নির্মলার মা সুশীলাদেবী সব খবরই রাখতেন। সুশীলাদেবী স্বামীকে বলেন যে তিনি যে নির্ম্মলাকে শুধুমাত্র লেখাপড়া গানবাজনা শিখিয়েছেন বই পড়া ছাড়াও যে একটা লোকালয় আছে, সেখানকার ভালোমন্দ অভাব অভিযোগ কোনদিনই সে বুঝতে শেখেনি। কাজেই এখন একান্নবর্তী শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে কি সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে সে চিন্তা বড় হয়ে দেখা দেয় সুশীলাদেবীর মনে।

যামিনীর সঙ্গে নির্ম্মলার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর নির্ম্মলা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে এল। এতদিন পর্যন্ত নির্ম্মলা একাকী তার জ্ঞানের এবং ভাবের রাজ্যে বাস করত এখন যখন সেখান থেকে একেবারে সাধারণ সংসারে সকলের মাঝে গিয়ে পড়ল তখন নিজের অবস্থা অনুভব করে ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। এদিকে যামিনীও অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে উঠল নির্ম্মলাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করে পাবার জন্য। 'নির্ম্মলা যদি সহজেই ধরা দিত, হয়ত যামিনী এত অশান্ত এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত না'[৪৯]

যামিনীর বড় বৌদি মানুষ খারাপ না হলেও সমস্ত সংসারকে উপেক্ষা করে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যামিনীর বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না আর এরজন্য নির্ম্মলাকেই সে দায়ি করল এবং মনে মনে তার অনিষ্ঠসাধন করবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল। শুধু বড় বৌদি নয় শ্বশুরবাড়ির সকলেই নির্ম্মলাকে ভুল বুঝতে লাগল। নির্ম্মলা সম্বন্ধে সকলে বলতে লাগল —

> ''...কলেজে পড়া বিবি-বউ, তাই সারাদিন স্বামীর সঙ্গে ফুস-ফুস গল্প গুজব করিয়া কাটান। অশিক্ষিতা মেয়েদের উপর তাঁর ঘৃণা, সেইজন্যে নিজের ঘর ছাড়িয়া একবারও বাহিরে আসিয়া শাশুড়ীর যত্ন সেবা করিতে কি জা-ননদের সঙ্গে দুটো গল্প করিতে মন ওঠে না।...''[৫০]

বিয়ের সময় নির্ম্মলার গহনাগুলি যে তার স্বামী যামিনীরই কিনে দেওয়া একথা জানতে পেরে শ্বশুরবাড়ির সকলে নববধূর পিতার ওপরও ক্ষিপ্ত হয়ে নানা কথা বলল, যামিনীকে তার মা যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে এজন্য। যামিনী তার স্ত্রীকে নিয়ে কোলকাতায় চন্দ্রনাথবাবুর কাছে স্ত্রী নির্মলাকে রেখে মেসে ফিরে যায়।

এদিকে মেসে এসেও যামিনীর মন বসে না। সে তার স্ত্রীর নির্ম্মলার চিঠির অপেক্ষায় থাকে কিন্তু চিঠি আসেনা। এদিকে যামিনীর মেসের উল্টো দিকে এক সুন্দরী গণিকা তাকে জিনের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। যামিনীর বিভ্রান্ত মন গণিকার সাজানো গল্প খানিকটা বিশ্বাস করলেও খুব তাড়াতাড়ি সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং সেখান থেকে সরে আসে।

যামিনীর বাবা ভীষণ অসুস্থ হওয়ায় যামিনীকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতে বলা হয়েছে। যামিনী

তার দেশের বাড়ি চলল।

যামিনীর বন্ধু নিখিল নির্ম্মলাদের বাড়িতে এসে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে নিজের সংসারে ফিরে যেতে কারণ সে যামিনীর বিশেষ বন্ধু।

এদিকে চন্দ্রকান্তবাবুর সংসারেও অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। চন্দ্রকান্তবাবুর শারীরিক অসুস্থতা দিনকে-দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। নির্ম্মলার দুই দাদা তাদের শ্বশুরালয়েই একরকম থাকে। কেবল ছোটদাদা মুরলী মার্চেন্ট অফিসে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি করে কোনরকমে সংসার চালাচ্ছে। মা সুশীলাদেবী নিজে হাতেই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে। আয় কম বলে ঠিকা ঝিকেও সুশীলা ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রকান্তবাবুও এখন নির্ম্মলাকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত, তিনি বুঝতে পেরেছেন এতদিন মেয়েকে তিনি বড় বেশি আগলে রেখেছেন তাই সংসার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। সংসারে সবার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না।

নির্ম্মলার এখন প্রতিনিয়ত মনে হয় তার জন্য তার স্বামীর যেমন করুণ পরিণতি তার পিতৃপরিবারের সকলের অসুবিধার কারণ। তাই নির্ম্মলা কাতর হয়ে ভাবে —

‘‘আমার জন্য আমাদের বাড়ির কাহারও মনে সুখ নাই। আমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার পিতা পীড়িত, মা তো আমাকে দেখিলে বিতৃষ্ণায় মুখ ফেরান। আমার দুঃস্থ ভাইরা আমার মত স্বর্থপরকে পর মনে করে। কাছে গেলে সঙ্কুচিত হয়। এত বড় নিরানন্দের বোঝা কেন আমি সকলের ঘাড়ে চাপাইলাম। হে প্রভু, ইহার হাত হইতে কি আমার মুক্তি নাই?’’[৫১]

বিশেষত নির্ম্মলা হিন্দুর মেয়ে হয়ে স্বামী সংসার ছেড়ে সে যে পিতার ঘরে বসে রয়েছে এতে সমাজ পরিবারের সকলেই নির্ম্মলাকে দোষ দিতে লাগল। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে সমাজ সংসারের সকল পরিবেশে মানিয়ে চলার দায়িত্ব তো তারই, কাজেই নির্ম্মলাকে সকলে যেমন ভাবে সে নিজেও নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। সমাজের মানুষজন তো দূরঅস্ত, নিজের পিতৃপরিবারের লোকেরাও যে মেয়েটির সমস্যা বোঝার চেষ্টা করে না মেয়েটির এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

স্ত্রী নির্ম্মলার কাছ থেকে প্রেম, স্নেহ আশ্রয় পূর্ণ দীর্ঘ চিঠি খুবই প্রত্যাশা করেছিল যামিনী তার বদলে এমন সংক্ষিপ্ত কাটা ছেঁড়া চিঠি পেয়ে সংসারের প্রতি তার বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল।সে কোলকাতায় ধর্ম্মতলা অঞ্চলে একটি বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সেখানে যামিনী দেবীপ্রসাদ নামে একটি লোকের সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটায়। দেবীপ্রসাদের সঙ্গে বিকালে সে মদের আসর বসায় — বন্ধু নিখিল হঠাৎ একদিন যামিনীর ধর্ম্মতলার বাড়িতে গিয়ে এসব জানতে পারে। নিখিলকে তার বাড়িতে

হঠাৎ দেখে যামিনীও তাই যেমন অবাক হয় তেমনি লজ্জিত হয়।

যামিনীর অবস্থা দেখে নিখিলের অত্যন্ত করুণা হলেও যামিনীর প্রতি তার বিতৃষ্ণাও হয়, সে ভাবে —

> ''... এই ধরনের সেন্টিমেন্টাল লোকেদের প্রকৃতির মধ্যে কোন একটি ধারাবাহিকতা নাই। ভাবের রসে বুঁদ হইয়া সপ্তম স্বর্গে উঠিতেও ইহাদের যতক্ষণ একেবারে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেও ততক্ষণ!''[৫২]

ঐদিনই যামিনী নিখিলের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বাবুর ওখানে যায়। যামিনী আসাতে চন্দ্রকান্তবাবু অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে পড়েন। নির্ম্মলা কিন্তু অত্যন্ত ধীরস্থির সে অত্যন্ত সাবলীলভাবে স্বামী যামিনীর সঙ্গে কথা বলে। যদিও খুবই অল্প কারণে পাশের ঘরে পিতা চন্দ্রকান্তকে দেখাশুনার জন্য আবার তার কাছে ফিরে যায়। ''যামিনী তখনও তাহার দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।''[৫৩]

যামিনীর যখন ঘোর কাটে তখনই সে সেখান থেকে চলে যাবার জন্য উদগ্রীব হয় কারণ সন্ধ্যাতেও সে মদ্যপান করেছে, তার মুখ থেকে সুরার গন্ধ পেয়ে স্ত্রী নির্ম্মলা তাকে ঘৃণা করবে ভেবেই সে কাউকে কিছু না বলে শ্বশুরালয় থেকে পলায়ন করতে তৎপর হয়।

নির্ম্মলার ছোট দাদা মুরলীর টাকার বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে নইলে হয়তো তার চাকরী থাকবে না এমনকি অপিসের তহবিল থেকে সে টাকা নিয়ে উপরওয়ালাকে ঘুস দিয়েছিল চাকুরী বাঁচাবার জন্য। সেই টাকা জোগাড় করতে না পরালে তার জেল পর্যন্ত হতে পারে। তাই সে তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করছিল তাঁর মায়ের গহনা বেঁচে যদি এ যাত্রায় সে রক্ষা পেতে পারে কিন্তু যখন শুনল সংসার চালাতে গিয়ে সেগুলো সুশীলা দেবী ইতিমধ্যে গোপনে বিক্রয় করেছেন তখন ভয়ে ভাবনায় তার দিশেহারা অবস্থা হল।

মুরলী নির্ম্মলাকে তার সমস্যার কথা জানায়, নির্ম্মলা তার স্বামীকে বলে যদি কিছু টাকার বন্দোবস্ত করতে পারে। কিন্তু নির্ম্মলা কিছুতেই রাজি হয় না, তার অত্যন্ত আত্মসম্মানে লাগে।

নিরুপায় মুরলী আত্মহত্যা করে। শোকস্তব্ধ বাড়িতে যামিনী আসে। রোরূদ্যমান নির্ম্মলাকে যামিনী কাছে টেনে নেয়। নির্ম্মলা-যামীনিকে একসঙ্গে দেখে রোগগ্রস্ত শোকগ্রস্ত চন্দ্রকান্ত তার মধ্যেও চোখ মেলে রইলেন এবং ক্ষীণ কণ্ঠে বলেলেন —

> ''তোমাদের এই মিলন স্থায়ী হোক, সত্য হোক। আর যেন না তোমাদের বিচ্ছেদ হয়। নির্ম্মলা, আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলুম।''[৫৪]

উপন্যাসটিতে যেন খুব দ্রুতগতিতে নির্ম্মলা-যামিনীর মিলন দেখানো হল। তবে এই মিলনে নির্ম্মলা কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরা দেবে সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

তবে এইভাবে উপন্যাস শেষ করার মধ্যেও লেখিকা আশালতার একটা বিদ্রোহ হয়তো রয়ে গেছে; কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেভাবে মেয়েদেরকে দেখতে চায় নির্ম্মলাকে শেষ পর্যন্ত আশালতা অনেকটা সেভাবে না গড়লেও তার পিতা চন্দ্রকান্তবাবুর মুখ দিয়ে বলালেন যে মেয়েদের স্বামীকে নিয়ে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের মানিয়ে নিয়েই চলতে হয়। আর এজন্য নির্ম্মলাকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছে। তার প্রিয় দাদা মুরলীকে অকালে হারাতে হল এমনকি পিতাও তখন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। হঠকারী অবিবেচক যামিনীকে তার সমস্ত আবিলতা নিয়েও গ্রহণ করতে সে একরকম বাধ্য হয়েছে।

সুতরাং এ উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও আমরা বুঝতে পারি আশালতা খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও গিলবার্ট এবং গুবারের তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। কারণ আপাত বক্তব্যের ভেতরে লুকিয়ে আছে লেখিকার আসল বক্তব্য যা সচেতন পাঠককে বুঝে নিতে হবে।

নির্ম্মলা যদি মেয়ে না হয়ে কোন পুরুষ হতো তাহলেও কি তাকে এমন দুর্বিপাকে পড়তে হত? নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিতে হত? প্রশ্নগুলি পাঠকের সামনেই তুলে ধরেছেন লেখিকা।

'পরিবর্তন' — উপন্যাসটি ১৯৩৫ সাল নাগাদ লেখা। এই উপন্যাসে দেখা যায় নায়িকা শিশিরকে; সে পশ্চিমের এক সহরের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীলের কন্যা। আধুনিকা এবং সুশিক্ষিত। তার বিয়ে হল বঙ্গদেশের এক অজ পাড়াগাঁ নূরপূরের জমিদার সুবোধের সঙ্গে। সুবোধও সুশিক্ষিত এবং নম্র স্বভাবের। পল্লীর দৈন্য-দুর্দশা তাকে পীড়িত করে এবং পল্লীর সমস্যা সমাধানে সে উদ্যোগী হয়। শিশির কিন্তু গ্রামে থাকতে পারল না। গ্রামের মেয়েদের অশিক্ষার প্রভাবে হৃদয়-দৈন্য ও রুচিহীনতা সে সহ্য করতে না পেরে কোলকাতায় আসে। কিন্তু কোলকাতায় এসে আধুনিক সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নীতিবিগর্হিত রুচির সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারে না। তার মনের মধ্যে পরিবর্তন এল এবং তার প্রথম সন্তানকে নিয়ে সে গ্রামে ফিরে গেল। চিকিৎসার অভাবে একমাত্র পুত্রের অকাল প্রয়াণেও সে গ্রাম ত্যাগ করল না। গ্রামের উন্নতির জন্য সে এখন তার উদারচিত্ত স্বামীর সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে চায়।

এই উপন্যাসের প্রথমে দেখি সর্দ্দার বিল পাশ হচ্ছে, নারী জাগরণের জোয়ার এসেছে কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখি শিশিরের মতো একজন প্রগতিশীল মেয়ে গ্রামীণ বাতাবরণে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নিজের প্রথম সন্তানকে হারিয়েও সে ক্ষান্ত হয়নি, কর্তব্যই তার কাছে

বড়। তার স্বামী গ্রামের লোকেদের জন্য নিজের খরচে রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে। আর গ্রামের মাতব্বর লোক এই বোকা লোকটার উদারতার ফল ভোগ করলেও সেই গ্রীমাণ স্বার্থপর অশিক্ষিত লোকেদের কোন উদারতা নেই। তাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয় না। চরিত্রের পরিবর্তন তথা মানবিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হয় শিক্ষিত প্রগতিশীল মেয়েটিকেই। শিশির গ্রামে ধীরে ধীরে সহিষ্ণু মেয়েদের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে নেয়, তার বুক ফাটলেও যেন মুখ ফোটে না, নীরবেই ভাগ্যের সমস্ত মার, জীবনের সমস্ত অবিচার সহ্য করে, অবিচারের বোঝা বইতে বইতে ফুরিয়ে গেলেও সেই গ্রামেই থাকার সংকল্প নেয়, নিজের মানব জন্মকে ব্যর্থ হতে দেয়, কারণ এ ধরনের মেয়েই তো আমাদের সমাজ চায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এদেরই সম্মান করে। এ ধরনের নায়িকা সৃষ্টি করলে তবেই না মহিলা লেখিকার স্পর্ধাকে, লেখনীকে বরদাস্ত করা সম্ভব! নইলে সেই লেখিকাকে 'ব্ল্যাক লিস্টেড' করা হবে। এটাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধান।

'বাস্তব ও কল্পনা' — ফাইন আর্ট পাবলিকেশন থেকে উপন্যাসটি দুবার প্রকাশ করেন প্রকাশক রাধারমণ দাস। ৪-৫-৪৯(বাংলা) তারিখে শ্রী আশালতা সিংহ বইটি উৎসর্গ করেন বীরভূম গৌর শ্রীযুক্ত নিশাপতি মাঝি মহাশয়কে।

সবিতা আই এ পাশ করে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি.এ. পরীক্ষার উদোগ করছে এমন সময় সবিতার মা বিমলা দেবী মারা গেলেন। পিতা প্রফেসর নরেশবাবু সবিতা এবং সবিতার দাদা সত্যসুন্দরকে নিয়ে চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখলেন। কারণ সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল বিমলাদেবীর ওপর। উনিশ বছরের সবিতা কোনদিন রান্না ঘরের ত্রিসীমানা মাড়ায়নি। এখন রান্নার দিক তদারকি করতেও সবিতা রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে। তার উপর রয়েছে পরীক্ষার প্রস্তুতি। দাদা বিলেতে থাকে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র এবারই শেষ বছর। পড়া শেষ করে সে দেশে ফিরে আসবে।

যাইহোক দেশে পিতা পুত্রী কোনরকম হাবুডুবু খেয়ে যখন সংসার যাত্রা নির্বাহ করছে এমন সময় জানা গেল সবিতা ঘুব ভালো নম্বর পেয়েই অনার্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। দাদাও ভাল রেজাল্ট করেছে এবং দেশে ফিরছে।

সত্যসুন্দর ফিরে আসবার সপ্তাহখানেকের মধ্যে বাড়ী ঘর দুয়ারের চেহারা পাল্টে ফেলতে সবিতা উদ্যোগী হল, রাঁধার জন্য একজন বাবুর্চিও রাখা হল।

যদিও সত্যসুন্দর এত সব আয়োজন দেখে অবাক হয় কারণ বিলেতে থাকলেও সে সাদা মাটা বাঙালী জীবনেই অভ্যস্ত থেকেছে।

সত্যসুন্দর একদিন তার বিশেষবন্ধু বিনোদকে তার বাড়িতে ধরে আনল। সেও বিলেতে ডাক্তারি পড়েছে, এখন কোলকাতায় মেসে থাকে,তার বাড়ি পূর্ববঙ্গের কোন এক গ্রামে।

বিনোদ ঠিক করেছে সে তার গ্রামে ফিরে গিয়ে গরীব দুঃস্থ লোকেদের সাহায্য করবে তাই সেখানেই সে ডাক্তারী করবে। আর তাছাড়া চাকরীর বাজারও যথেষ্ট মন্দা চলছে কাজেই সে চাকরীর চেষ্টা আর করবে না বরং গ্রামেই যাবে। একথায় নরেশবাবু যেমন অবাক হন সবিতাও তেমনি। সবিতা মার্জনা চেয়ে বিনাদকে প্রশ্ন করেই বসে —

> ''জীবনের উদার ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে নিজেকে ব্যপৃত করে রাখবেন!''[৫৫]

যদিও বিনোদ এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়, কিন্তু শহরের মেয়েদের বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপনকেও সে কটাক্ষ করে।

এদিকে নরেশবাবুর শরীর তেমন ভালো নেই তাই ছেলে এবং মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চান। ইতিমধ্যে সত্যসুন্দর একটি ভালো চাকুরীর নিয়োগপত্র পায়, তাই বাড়িতে সবিতা একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সত্যসুন্দর বন্ধু বিনোদকেও জোড় করে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে আসে যদিও এমন কোলাহলপূর্ণ অনুষ্ঠানকে সে বরাবরই পাশ কাটিয়ে যেতে পছন্দ করে।

অনুষ্ঠানে সবিতা প্রতিমা মিত্রের সঙ্গে বিনোদকে আলাপ করিয়ে দেবার সময় সবিতা প্রতিমাকে জানায় যে আজকালকার আধুনিক শিক্ষিত শহরের মেয়েদেরকে বিনোদবাবু একদম পছন্দ করেন না। এতে প্রতিমাও বলে —

> ''আশ্চর্য্য নয়। আজকাল আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত যুবকের এমনই একটা রি-এ্যাকশন এসেচে। জীবিকার ক্ষেত্রে সবাই যেমন বলতে চায় ব্যাক টু ভিলেজ, গ্রামে ফিরে যাও; মেয়েদের বেলাতেও বলতে সুরু করেচে লেখাপড়া জানা মেয়ে চাইনে। কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা খাড়ু আর বাউটি হাতে সেই যে আগেকার মেয়ে, সে মেয়েই আমাদের ভালো।''[৫৬]

বোঝা যাচ্ছে তারা সেই সময়ের সমাজের পুরুষদের মানসিকতার কথা বলছে।

বাদ-প্রতিবাদে পুরো অনুষ্ঠানের আবহাওয়া যখন উত্তপ্ত তখন সেটা হাল্কা করতে সত্যসুন্দর কবিতা আবৃত্তির অনুরোধ করে বিনোদকে। সত্যসুন্দর নিজেও আবৃত্তি করল। প্রতিমা 'নটীর পূজা' এবং রক্তকরবী থেকে গান গাইল, সবিতাও গান গাইল। অন্যান্য উপন্যাসের নায়িকাদের মতো

আশালতার এই উপন্যাসের নায়িকারাও গান জানে। সবশেষে বিনোদ রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিল।

এরপর বিনোদ দেশে যায় তার গ্রামের বাড়িতে। বিনোদের হঠাৎ বাড়ি আসাতে বাড়ির সকলেই খুব খুশি। গ্রামের দশ-বারোটি ছোট ছেলে বিনোদকে ঘিরে ধরে। বিনোদ তাদের প্রত্যেকেই নানা রকম খেলনা, চকোলেট প্রভৃতি বের করে দেয়।

বিনোদের পিতা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে শহরে সে কোন চাকরীর ব্যবস্থা করতে পেরেছে কিনা তখন বিনোদ জানায় সে চাকরীর চেষ্টা তেমন করেনি, গ্রামেই গরীব মানুষের সেবা করবে। একথা শুনে বিনোদের পিতা খুশি হতে পারলেন না। কারণ প্রথমে তিনি যদিও চেয়েছিলেন যে ছেলে ডাক্তার হয়ে এসে গ্রামের লোকেদেরই চিকিৎসা করবে কিন্তু ক্রমে উপলব্ধি করেন যে পাড়াগাঁয়ে ছেলের কোন ভবিষ্যত নেই।

এর মধ্যে বেশ কয়েকদিন গ্রামে থেকে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে বিনোদ উপলব্ধি করে যে এদের কি চরম দুরবস্থা, কী অসহায় এরা। বিনা চিকিৎসায় কীভাবে এরা মরণের দিকে এগিয়ে যায়। এদিকে সত্যসুন্দরের বিয়ে, প্রতিমা মিত্রের সঙ্গে। সত্যসুন্দর বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র সহ ব্যক্তিগত পত্রেও বারে বারে লিখে পাঠিয়েছে বিনোদকে তার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে।

বিনোদ আসে বিয়ের দিন। সকলেই খুব আনন্দিত। সবিতার পিতা নরেশবাবুর প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল সবিতার সঙ্গে বিনোদের বিয়ে দেন কিন্তু বিনোদ যেহেতু গ্রামে থাকা স্থির করেছেন তাই সবিতার গ্রামের গিয়ে থাকা যথেষ্ট কষ্টের হবে ভেবে তিনি পিছিয়ে এসেছেন।

সত্যসুন্দরের বিয়ের কিছুদিন পর বিনোদের কাছে চিঠি যায়, নরেশবাবু খুব অসুস্থ তাই বিনোদ যেন তাড়াতাড়ি কোলকাতায় যায়। বিনোদও চিঠি পাওয়া মাত্র রাতের ট্রেনেই কোলকাতা রওনা হয়। বিনোদ গিয়ে দেখে সত্য সুন্দরের স্ত্রী প্রতিমাই এখন গৃহকত্রী। তার হুকুমেই সমস্ত চলে। সবিতা শুধু কলের পুতুলের মত কাজ করে যায়। সবিতার মধ্যে আগের চঞ্চল সপ্রতিভ যুবতীর ছায়ামাত্র নেই।

এর কিছুদিন পর সত্যসুন্দর তার স্ত্রী এবং বোন সবিতা সহ বিনোদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসে। বিনোদের বাড়িতে খাবার খেয়ে তাদের আতিথেয়তায় সকলেই মুগ্ধ হয়। বিনোদের মা হরসুন্দরী নিজে তদারকি করে সকলকে আহার করান।

আপন অজ্ঞাতসারে সবিতা এবং বিনোদ পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। এদিকে সবিতার পিতা নরেশও উপলব্ধি করেছিলেন যে তার মেয়ে সবিতা হয়তো কোন না কোনভাবে বিনোদকে পছন্দ করে। তাই নরেশ বিনোদকে চিঠি দিয়েছিলেন সবিতার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। বিনোদেরও এ বিয়েতে

কোন আপত্তি থাকে না শুধু তার একমাত্র আশঙ্কা সবিতা হয়তো গ্রামে এসে সকলের সাথে মানিয়ে চলতে পারবে না।

এর কিছুদিন পর নরেশ মারা গেলেন। এখন এ বাড়ির গৃহিনী প্রতিমা সন্তান সম্ভবা। নরেশবাবু উইলে তার মেয়ে সবিতার জন্য বসতবাড়ির অর্ধেক এবং অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার টাকা রেখে গেছেন। উইলের এক্সিকিউটর তিনি বিনোদকে করেছেন।

এর কিছুদিন পর বিনোদ আসে সবিতাদের বাড়ি। বিনোদ বলে যে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নরেশবাবু বিনোদকে চিঠি দিয়েছিলেন। সবিতা সে চিঠি সম্বন্ধে জানতে চাইলে বিনোদ প্রথমেই সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইল না। যাবার আগে বিনোদ সবিতার কাছে সরাসরি প্রস্তাব করে যে সে বিনোদকে বিয়ে করে গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে থাকতে পারবে কি না? উত্তরে সবিতা জানায় যে তার আপত্তি না থাকলেও বিনোদবাবুর মা হয়তো তাকে মেনে নেবেন না। বিনোদ চিঠি দিয়ে সবিতাকে এবং সত্যসুন্দরকে জানায় যে, সবিতাকে সুখী করতে পারলেই বিনোদ নিজেকে সার্থক মনে করবে।

সবিতার সঙ্গে বিনোদের বিয়ের পর থেকেই সবিতা এবং বিনোদ দুজনেই উপলব্ধি করল একটা মস্ত ভুল হয়েছে। শহুরে, শিক্ষিতা, আধুনিকা সবিতার পাড়াগাঁয়ে অবস্থা হল ডাঙায় তোলা মাছের মতন।

বিনোদ গবেষণা, ডাক্তারি নিয়ে ব্যস্ত অথচ সবিতা প্রায় নিঃসঙ্গ। কারণ গ্রামের পাঁচজন মহিলাদের মত সবিতা কখনো দুপুরে তাস খেলে কিংবা পরের বাড়ির হাঁড়ির খবর নিয়ে আলোচনা করে কালাতিপাত করতে পারত না। উপরন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে তার এতটুকু মিশতে পারা ছিল দুঃসাধ্য। তারাও যেমন সবিতাকে অপছন্দ করত সবিতাও পারতপক্ষে তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলত। শুচিবায়ুগ্রস্ত শাশুড়িরও সবিতার কোন কাজ পছন্দ হত না। সবসময় তসরের শাড়ি পরে গঙ্গাজল নিয়ে তবে রান্নাঘর কিংবা ভাঁড়ার ঘরের কোন জিনিষে হাত দেওয়া যাবে, প্রতি পদক্ষেপে এটা ছোঁয়া যাবে না, ওটা ছুঁয়ে স্নান করতে হবে — এমন সব বিধিনিষেধে শহুরে শিক্ষিতা, আধুনিকা, সংস্কারমুক্ত সবিতা যেন নাজেহাল হয়ে উঠেছিল।

সবিতা মাঝে মাঝে বিনোদকে বলত যেন তাকে কিছুদিনের জন্য কোলকাতায় রেখে আসা হয়। কিন্তু সত্যসুন্দরের স্ত্রীর ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে সবিতাকে বিনোদ বোঝানোর চেষ্টা করত যে এখন সবিতার গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে আপন ঘরে সব কিছু বুঝে নেওয়া উচিত।

দীঘির ধারে বিনোদ যে নতুন গৃহখানি নির্মাণ করেছিল সেটা এখনো অনেকটা বাকি রয়েছে। সেটা তৈরী হলে তবু সেখানে সবিতা একা তার স্বামীকে নিয়ে নিজের গৃহস্থালি বুঝে নিতে পারত কিন্তু

তা এখনো অনেকখানি বাকি ভেবে সবিতার হতাশ লাগে।

কিন্তু কিছুদিন থেকে বিনোদও সবিতার চরম একাকীত্ব অনুভব করছিল। এদিকে সত্যসুন্দরের স্ত্রী প্রতিমা যখন জানতে পারে যে বিনোদের যথেষ্ট অর্থ রয়েছে এবং সবিতা ইচ্ছা করলেই পৈতৃক বাড়ির পুরোটাই দাদা সত্যসুন্দরকে লিখে দিতে পারে তখন প্রতিমা আগের মতো আর সবিতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল না। প্রতিমার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সে ননদ সবিতা এবং নন্দাই বিনোদকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল। কোলকাতা থেকে আসা নিমন্ত্রণ পত্র ও চিঠি পেয়ে সবিতা যখন কাঙালের মত বিনোদের কাছে কোলকাতায় যাবার আর্জি জানায় তখন বিনোদ বলে যে সবিতার সাথে সে নিজেও কোলকাতায় ক'দিনের জন্য গিয়ে ঘুরে আসবে।

কোলকাতায় আসার পর সবিতা যখন দাদা বৌদির কাছে উষ্ণ অভ্যর্থনা পায় তখন সে আবার আনন্দে উচ্ছ্বল, চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোলকাতায় আত্মীয়-বন্ধুদের সংস্পর্শে, কুসংস্কারমুক্ত নাগরিক জীবনের চঞ্চলতার তালে তাল মিলিয়ে সে যখন নিজের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দময় জীবন ফিরে পেয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক আনন্দময় হয়ে ওঠে তখন বিনোদ, তার এই রূপ দেখে ভাবে যে তার আদর্শ, গ্রামের উন্নতি করতে গিয়ে সে সবিতার মত মেয়েকে বলি চড়াচ্ছিল যা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

এর কিছুদিনের মধ্যে বিনোদ সাহেব কোম্পানীর চাকরী নেয় কোলকাতাতেই এবং স্ত্রী সবিতাকে জানায় যে তারা আর গ্রামে ফিরবে না।

একথা শুনে সবিতা যখন আনন্দে সংশয় প্রকাশ করে তখন বিনোদ বলে যে —

> "... দেশে কেন ফিরে যাব? দেশে আছে কি? ম্যালেরিয়া, শেয়াল আর ঝিঁঝিঁর ডাক, পানাপুকুর, ডোবা। যত সব অসভ্য চাষার দল। তাছাড়া যাও বা আছে দিনকে দিন আরও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কিছুই থাকবে না।"[৫৭]

'সহরের মোহ' —

আশালতা সিংহ ১৯৩৬ সালে লেখেন এই উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে দেখা যায় শান্তাকে যে মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে, পিতা নাম করা উকিল, বড় দাদা ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। শান্তা দাদার কাছে ফটোগ্রাফি শিখেছিল, সে ভালো ফটোগ্রাফার। সে গান জানে, সেলাই জানে। এই শান্তার বেথুন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয় গ্রামের ছেলে প্রকাশের সঙ্গে। সে এখন এম.এ পাশ করে ল'পড়ছে। সুদর্শন যুবক প্রকাশের বাড়ি গ্রামে হলেও শান্তার পিতৃ পরিবার ভাবে দু'বছর পরে

প্রকাশ প্রসার জমাতে সহরেই চলে যাবে। ইতিমধ্যে শান্তার বাবা, বড় দাদা পরলোক গমন করেছেন। শান্তার শ্বশুরও ছেলেকে পড়াতে গিয়ে দেনা করে ফেলে। ফলে দারিদ্র্য হয়ে দাঁড়ায় শান্তার নিত্যসঙ্গী। দিনকে দিন শান্তার সংসারে অভাব-অনটন বাড়তেই থাকে। স্বামীর এই দুঃসহ অবস্থায় শান্তা কোমর বেধে লাগে সৎপথে কিছু আয় করে সংসারটাকে বাঁচাতে। শান্তার সম্পর্কে দেওর প্রশান্ত আসে শান্তাদের বাড়িতে। শান্তা নিজেদের সাংসারিক অভাবের কথা প্রশান্তর কাছে গোপন করে না। শান্তা এক বিকেলে ঐ পাড়ার ধনী ব্যক্তি ললিতবাবুদের বাড়ি গিয়ে তাদের মেয়ে অশোকার গৃহক্ষিয়িত্রীর চাকরিটা নিজেদের জন্য পাকা করে। স্বামী প্রকাশও নিরূপায় হয়ে এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না। এদিকে প্রশান্ত শান্তার হাতে তৈরী সেলাইয়ের দু-একটি নমুনা কোলকাতায় লোকেদের কাছে নিয়ে গেলে সেগুলি লোকেদের প্রশংসা পায় এবং চড়া দামে বিক্রি হয়। প্রকাশ ওকালতিতে কোনভাবেই কোন আয় করতে পারছে না দেখে সে ভাবে তার গ্রামের ভিটায় ফিরে যাবার কথা। ভাবনা অনুযায়ী প্রকাশ গ্রামের স্কুলে একটি দরখাস্তও পাঠায় মাস্টারী চাকরির জন্য। সেখান থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রামে মাস্টারী করবার জন্য আহ্বানও জানায়। প্রকাশের স্ত্রী শান্তা কিছুতেই গ্রামে যেতে রাজি হয় না। কারণ গ্রামে না আছে ভালো স্কুল কলেজ, ডাক্তারখানা, না আছে শহরের মতো সুযোগ সুবিধা। শান্তা তার সাত বছরের মেয়ে শোভাকে ইতিমধ্যে শহরের একটি স্কুলে ভর্তিও করেছে। শান্তা ভাবে শোভা যখন গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে থাকবে তখন সে তার এতদিনের মার্জিত সংস্কার, নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে। তবুও শেষ পর্যন্ত প্রকাশের কথাতেই শান্তাকে রাজি হয়ে মেয়েকে নিয়ে গ্রামেই আসতে হয়। গ্রামে এসে শান্তার মার্জিত সংস্কৃত রুচিবোধ পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়। গ্রামের অনেকে তাকে ম্লেচ্ছও বলে আড়ালে আবডালে। শান্তা শহরে ফেরার জন্য যখন ব্যাকুল তখন প্রশান্ত চিঠিতে জানায় যে প্রকাশের শহরে একটি কাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। শান্তা উৎফুল্ল হয়ে স্বামীকে তাড়া দেয় শহরের চাকরিটা নিতে কিন্তু ততদিনে প্রকাশ গ্রামকে ভালোবেসে গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। প্রকাশেরই চেষ্টায় স্কুলটি গভর্মেন্টের গ্রান্ট পাবার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশ এখন আর গ্রামকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না।

উপন্যাসটিতে প্রকাশ যেভাবে তার নিজের জন্মভূমি গ্রামকে ভালোবেসে জনহিতকর ব্রতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে শান্তার গ্রামকে ভালবাসতে না পারা, গ্রাম্যতা সহ্য করতে না পারার মধ্যেও কোন ভন্ডামি নেই। শান্তার মন আগাগোঁড়াই নাগরিক মন। এ মন আশালতারও। ছেলেরা বাইরে কাজ করে, লোকের প্রশংসা কুড়ায়। সেই সময়ে যে মেয়ে শহরের উদার আধুনিক পরিমণ্ডলে শিক্ষা সংস্কৃতিতে নিজেকে আগাগোড়া ঘসে মেজে সচেতনভাবে যুগপোযোগী বা কখনো যুগের চেয়ে খানিকটা এগিয়েই নিজেকে নিয়ে চিন্তা করেছে তার যে গ্রাম্য এঁদো কূট কাচালিতে অসুবিধা হবে এতো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

পুরুষ পেষণের সবচেয়ে মধুর বিবাহ নামক ফাঁদটিকে নির্মমভাবেই চিনেছিলেন আশালতা সিংহ।

সেই মনোহর শৃঙ্খলে বন্দিনী নারীর শৃঙ্খলিত যে মূর্তি তিনি সাহিত্যে তুলে এনেছেন তা সমাজকে ধাক্কা দেবার জন্য, সচেতন করার জন্য যথেষ্ট।

'নূতন অধ্যায়' —

আশালতা সিংহের লেখা 'নূতন অধ্যায়'উপন্যাসটি মডার্ন পাব্লিকেশিং সিন্ডিকেট থেকে বের হয়েছিল। প্রকাশকাল- ফাল্গুন ১৩... প্রকাশক - সুরেশচন্দ্র দাস,দাম - দেড় টাকা

উপন্যাসটির প্রথমেই লেখিকা লিখছেন - 'বকুল গাছের তলায় প্রকান্ড এক দীঘি।'[৫৮] সেই দীঘি এবং গ্রাম সম্পর্কে দু'একটি প্রাকৃতিক বর্ণনার পর জমিদারদের প্রসঙ্গ এসেছে। অনেকটা যেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর কথা মনে পড়ায়।

এরপরেই লেখিকা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নায়িকা কমলার প্রসঙ্গে বলেছেন। গ্রামে বসবাস করলেও কমলা যেন যথেষ্ট স্বাধীন ও পরিবারেও যথেষ্ট আদরের পাত্রী। তার চলনে-বলনে একটা আত্মগরিমা রয়েছে। তার দাদারা শহরে পড়াশোনা করে এবং কমলা গ্রামে থাকলেও কমলার কাছে তারা তাদের গল্প কথা বলে আরাম পায়। কমলার জন্য নিয়ে আসে অনেক রকমের বই, কমলার হাতের চা না হলে তাদের চলেই না।

আজ থেকে একশো বছর আগে গ্রামে হয়তো চা-পান করার রেওয়াজটা খুব বেশি ছিল না কিংবা খুব সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার ছাড়া হয়তো এ জিনিসটার তেমন প্রচলন ছিল না।

কমলার পাঁচ দাদা, বাবা-নিত্যনারায়ণ বাবু- সংস্কৃতেপণ্ডিত। নিত্য নারায়ণ বাবুর পৈর্তৃক জমিদারী আছে, কলিয়ারীর কিছু আয় আছে, — এ থেকে সংসার খরচ চলে যায়। কমলার বাবা বহু জায়গায় ঘুরেছেন, সংসারী হয়েও তিনি খানিকটা সন্ন্যাসী গোছের। কমলার কাকা ঘোর সংসারী। তিনি তেজারতি ব্যবসা করেও প্রচুর টাকা করেছেন, তার একমাত্র ছেলে হরিদাস আবার জেঠুর ভক্ত, ছেলেটি গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করে বাড়িতেই সংস্কৃত পড়ে প্রথাগত বিদ্যায় আর তেমন অগ্রসর হয়নি।

কমলার কাকিমাও কমলাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তবে কমলার লেখাপড়ায় আগ্রহ কম বিশেষ করে সংস্কৃতে তার সবিশেষ অনিচ্ছা। কমলার দাদা বিশেষত বড়দা এম.এ ইংরেজী সাহিত্যে, সকলের মধ্যে তার কথার একটা বিশেষ পরিপাটি আছে। কমলা যখন চা করে তার দাদাদের দেয় তখন বড়দা কমলাকে বলে —

''কমল মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণ কি জানিস? তারা দেয় প্রত্যেক জিনিসকে

একটা শ্রী, একটা রূপাতীত ব্যঞ্জনা।''[৫৯]

কমলা এসব কথা ভালো না বুঝেও খুব শ্রদ্ধা সহকারে শোনে। কমলার দাদারা চায় কমলাকে আপ-টু-ডেট করে গ'ড়ে তুলতে আর সেইজন্য কমলার ইংরেজী শেখাটা বিশেষ জরুরী অন্তত তাদের এই মত। কমলার বড়দা খুড়তুতো দাদা হরিদাসকে ব'লে কমলাকে ইংরজী শেখায় কিন্তু হরিদাসের কাছে প্রকৃত শিক্ষার যে গভীর অর্থ তা কমলার দাদাদের মতো নয়। হরিদাস যেন ভোগ নয় ত্যাগ করতেই আগ্রহী, বয়সের তুলনায় যে যেন একটু বেশিমাত্রায় উদাসীন। বেশি ভাবুক, বেশি দার্শনিক, দুঃখেষুঅবিগ্নমনা সুখেসু বিগত স্পৃহ — সংসারে থেকেও যেন সন্ন্যাসী।

কমলার দাদারা ছুটিতে গ্রামে থেকে নব্যশিক্ষা, নব্যনীতি, নারী সমাজের অশেষ বিধ সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছে। ছুটি শেষ হলে শহরে গিয়ে আবার তাদের আগের মতোই ব্যস্ততা, সেই কোলাহল, উত্তেজনা, জনসংঘাত, কলেজে প্রক্সি দেওয়া, প্রফেসরদের নিয়ে সমালোচনা,নতুন নতুন সিনেমা, নতূন আর্টের ব্যাখ্যা। কোন কিছুই বাদ যায় না।

ইদানিং কমলার আর পুকুরে গা ধুয়ে, ফুল কুড়িয়ে সময় কাটে না,এমনকি সঙ্গিনীদের গ্রাম্যরসিকতাও তার মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। সে এখন সাবান মেখে বাড়িতে স্নান করে এবং ছোটদাদার পাঠানো হাল আমলের বাংলা নভেল পড়েই সময় কাটায়।

কমলার অতিরিক্ত নভেল পড়া হরিদাসের পছন্দ হয় না, সে বলে বেশি নভেল অনবরত পড়লে জীবনটাকেও সে নভেলের সঙ্গেই তুলনা করবে, সব সাধারণ জিনিসেই একটা অতৃপ্তি আসবে, কারণ কল্পনার উগ্রতার সঙ্গে বাস্তবের যখন মেলে না তখনই এই অতৃপ্তির উৎপত্তি হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ-শেক্সপীয়র এঁদের লেখা পড়লে মন আনন্দে ভরে যায়, কারণ বড় বড় শিল্পী আর তাঁদের সৌন্দর্যময় রচনারীতির কিছু কিছু ছাপ চিন্তার মধ্যে মনের অনেক সঙ্গোপন কোণের মধ্যে রয়ে যায়।

কমলার বড়দাদা এম.এ পাশ করে ল'পড়তে লাগল। হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থাকেন। সেখানেই শিবেশ্বরের সঙ্গে আলাপ এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দুজন একসঙ্গে ল'পড়ে। একই হস্টেলে থাকে। শিবেশ্বরের পিতা পশ্চিমের কোন একটা শহরে ওকালতি করে প্রচুর অর্থোপার্জন করে কোলকাতায় প্রাসাদতুল্য বাড়ি নির্মাণ করে কোলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এবারের পুজোর ছুটিতে শিবেশ্বরের পরিবারের সকলে যখন দার্জিলিং যায় তখন সে বন্ধু ধীরেনের সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়ি যাবে ঠিক করে কারণ এর আগে দার্জিলিং সে তিন বার ঘুরেছে। শিবেশ্বর এর আগে কখনো গ্রামে যায় নি।

বন্ধু শিবেশ্বর ধীরেনের বাড়ি আসবে সেজন্য আগে থেকেই ধীরেন চিঠি লিখে মা-কে সব ব্যবস্থা করে রাখতে বলে। ধীরেনের মা ও বোন কমলা মিলে আয়োজনের ত্রুটি রাখে না। গ্রামে গিয়ে শিবেশ্বরও

সকলকে আপন করে নেয় বিশেষ করে দু-চারদিনের জন্য বেড়াতে এসে সে সকলের মন ছুঁয়ে যায়। তার রাজপুত্রের মতো চেহারা, বুদ্ধিমত্তা এবং অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়।

ধীরেনের বোন কমলাও খুব আন্তরিকতার সঙ্গে চা করে, সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের তদারকি করে, বিকেলে দাদাদের ও তার বন্ধুর সাথে বেড়াতে বের হয়। শিবেশ্বর কমলার সেবাপরায়ণ মন, সৌন্দর্য এবং রুচিশীলতায় যারপর নাই আপ্লুত হয়। এরমধ্যে কমলার শিবেশ্বরের সান্নিধ্যে শরীর মনে আলাদা আনন্দের ঢেউ লাগে। শিবেশ্বরের সঙ্গে কমলার খোলাখুলি মেলা-মেশাতে মা সামান্য আপত্তি তুলেছিলেন বিশেষত তাদের পল্লীগ্রামের সমাজের কথা চিন্তা করে।

ক'টা দিন কাটিয়ে ট্রেনে ওঠার আগে শিবেশ্বর কমলার জন্য তার দাদা ধীরেনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখে। এতে ধীরেন অত্যন্ত বিস্মিত হয় বিশেষত শিবেশ্বরদের মতো ধনী মানুষদের সঙ্গে তাদের ফারাকের কথা ভেবে। ধীরেন বন্ধুর প্রস্তাবের কথা তার মাকে বলাতে মা প্রথমে আনন্দিত হলেও পরে ভাবলেন শুধুমাত্র পাত্রের ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় না।

কথাটা কমলার কানেও গেল। সে আমোদ ভালবাসে, নূতনত্বের উত্তেজনায় মেতে ওঠে কিন্তু নিজের মন বিশ্লেষণ করার মতো বিবেচনা তার ছিল না।

এদিকে কমলার পিতা নিত্যনারায়ণবাবু রোগশয্যায়, কমলা পিতার শুশ্রূষার কাজে সদা নিযুক্ত, এখন নিত্যনারায়ণ বাবুর একটাই চিন্তা - কন্যার বিবাহ। ইতিমধ্যে তিনি স্ত্রী এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলকে ডেকে নিয়ে বলেন যে বীরভূমের কোন গ্রামের জমিদার এবং নিত্যনারায়ণবাবুর বন্ধু স্থানীয় সুরেশ বাবু চিঠি দিয়ে তার ছেলের সঙ্গে কমলার বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। এ প্রস্তাবে বাড়ির গিন্নী প্রমীলাদেবী এবং বড় ছেলে ধীরেন বেঁকে বসে। তারা বলে যে যদিও কমলা গ্রামেই মানুষ হয়েছে তবু তার মধ্যে যে শিক্ষা-রুচি-স্বাধীনতার বোধ হয়েছে তাতে সে কিছুতেই অজ পাঁড়াগায়ে গিয়ে থাকতে পারবে না।

ছেলের কথা শুনে নিত্যনারায়ণবাবু তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানীর উদাহরণ টেনে বলেন— রানি গিরি ছেড়ে দেবী চৌধুরানীও সংসারের লোককে সুখী করতে গ্রামেই সংসার ধর্ম পালন করেছিল। এতে ধীরেন বলে—কমলা দেবী চৌধুরাণী নয় আর উচ্চ আদর্শের কথা শুনতে ভালো লাগলেও গ্রাম্য পরিবেশে দিনের পর দিন প্রতিদিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে মানিয়ে চলাও অনেক কঠিন।

যাহোক, নিত্যনারায়ণবাবুর অসুখ গ্রামের কবিরাজী ওষুধে না সারলে কমলা ও তার দাদারা পিতাকে নিয়ে কোলকাতায় ভবানীপুরে একটি বাসা ভাড়া করে চিকিৎসা শুরু করে। এদিকে শিবেশ্বরের বিধবা মা অসময়ের বন্ধু মিস্টার গুপ্তের মেয়ে নলিনীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয় কারণ তার মৃত স্বামীরও তেমনই ইচ্ছা ছিল। নলিনীর দাদা সুকুমার শিবেশ্বরের বন্ধু এবং তাদের দুজনের

একসঙ্গে বিলেত যাবারও কথা।

শিবেশ্বর কমলার কথা তার মা-কে বলাতে তিনি বলেন যে সে যেন নিজের একটা ঝোঁকের বশে আরো অনেকের জীবন নষ্ট না করে দেয় কারণ জীবনটা কাব্য নয়। এরপর হঠাৎ মিস্টার গুপ্তের অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়া এবং শিবেশ্বরের প্রতিশ্রুতি চাইলে তিনি নলিনীর সঙ্গে ছেলের বিয়ের প্রস্তাব পাকা করে মত দেন মিঃ গুপ্তকে।

শিবেশ্বরের বাড়িতে যেদিন ধীরেন ও তার বোন কমলার সপরিবার যাবার কথা সেদিন শিবেশ্বর বাড়িতে ছিল না। কমলা ও তার দাদা শিবেশ্বরের মায়ের মুখ থেকে শোনে নলিনী ও শিবেশ্বরের আগামী মাঘ মাসেই বিয়ে হবে। শিবেশ্বর এলাহাবাদে তার মাসির বাড়ি গেছে, — এধরনের অপমান ধীরেন ও কমলার মনে খুব আঘাত দেয়।

এরপর নিত্যনারায়ণবাবুর মনোনীত বিজয়ের সঙ্গেই কমলার বিয়ে হয়। কমলাকে পেয়ে তার স্বামী-শ্বশুরবাড়ির সকলেই যত উচ্ছ্বসিত কমলা তাদের পেয়ে তেমন নয়। এদের ঘর বাড়িও গ্রামীণ পরিবেশে কমলার মোটেও ভালো লাগেনি তবু সে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে, কাজকর্মও এগিয়ে এসে করেছে — কাজেই শাশুড়ী-ননদেরও বৌকে পছন্দ। কিন্তু কমলার স্বামী কোনভাবে বুঝতে পারে কমলা হয়তো সুখী হয়নি।

এদিকে শিবেশ্বর ধীরেনকে এক পত্র লিখে আক্ষেপ করে জানায় তার অপারগ অবস্থার কথা এবং সেই সঙ্গে এও লেখে যে কমলাকে বিয়ে করার যে প্রস্তাব সে ধীরেনকে বলেছিল তা নিশ্চয়ই কমলা জানে না কারণ বিবাহ নিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরে কখনো পাত্রীর সঙ্গে তার পরিবারের লোকেরা আলোচনা করে না। কাজেই কমলার মনে এ ঘটনা কোন রেখাপাত করেনি — এটা মনে ভেবেই যেন শিবেশ্বরের সান্ত্বনা। একথা চিঠিতে পড়ে ধীরেন মনে ভাবে যে সে কত বড় অন্যায় করেছে কমলাকে শিবেশ্বরের প্রস্তাবের কথা জানিয়ে। তার অনুশোচনা হয়। কমলার মায়ের খানিকটা দুঃখ হয়েছিল ধনী গৃহে মেয়ের বিবাহ হতে না পারায় তবে বাঙ্গালী হিন্দু ঘরে মেয়েদের ঐ ধরনের কত সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। এ দুঃখ তাই তার মনে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এর চেয়ে বেশি কিছু যে এ ঘটনার মধ্যে থাকতে পারে তা আন্দাজ করার মতো বিবেচনা বোধ কমলার মায়ের ছিল না। কিন্তু পিতা নিত্যনারায়ণবাবু তার অন্তর দিয়ে বোঝেন মেয়ে কমলার মনে একটা গোপন ব্যথা আছে। কমলা ঠিক করে সংসারে সবারই কাছে, প্রয়োজনে আয়োজনে নির্মল চিত্তে সে এখন থেকে যোগ দেবে, নিজের ভাবনা বলে আর কিছু সে হাতে রাখবে না।

পিতার বন্ধু সুরেশবাবু তার পুত্রের জন্য যেদিন কমলার মাতা-পিতার কাছে কথা দিয়ে গেলেন তারপর থেকে কমলা নিজেকে জোর করে একরকম প্রস্তুত করতে লাগল, সে যেন চেষ্টা করে অন্য

একটা মানুষ হল। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কোন সময় চুপ করে একা বসে থাকতে থাকতে তার দুচোখ জলে ভরে উঠত।

ধীরেন কোলকাতায় কমলার ভাবী স্বামী বিজয়ের সঙ্গে আলাপ করে, ধীরেনের মনে হয় বিজয় চমৎকার ছেলে, একথা বোন কমলাকে বলতে কমলা যথেষ্ট ক্ষোভের সঙ্গেই জনায় - বাঙালী মেয়ের কোর্টশীপ করে বিয়ে হয় না। বাবা মা ভালো বুঝে যার হাতে দেন সে টুকুতেই বাঙালী মেয়েকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

তবুও ধীরেনকে চায়ের নেমন্তন্ন করাতে একদিন শিবেশ্বরের বাড়িতে সে যায়। শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা নয়, কৌতূহলের বশেও বটে। ধীরেন এসে কমলাকে জানায় — শিবেশ্বরের নতুন গৃহস্থালীতে শিবেশ্বর মোটেই স্বচ্ছন্দ নয়, সবই যেন বেশি রকম মেকি, শিবেশ্বরকে ধীরেন অনেককাল চেনে, এ ধরনের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে শিবেশ্বরকে নিজের স্বভাবের হত্যা করতে হয়েছে, যা আত্মহত্যার সামিল। যদিও এসব কথা শুনতে কমলার ঠিক ভালো লাগছিল না। ধীরেন কিছুক্ষণ অপরাধীর মতো চুপ করে থেকে বোনের কাছে এক পেয়ালা চায়ের জন্য আর্জি জানায়।

বিবাহ করা ছিল কমলার কাছে কর্তব্য। সে তাই নিজেকে কেবল প্রস্তুত করে তুলছে শুষ্ক ক র্তব্যের জন্য। কমলার নতুন বিবাহের জন্য সৌন্দর্যময় প্রেমের কোন রঙই ছিল না তার মনে। তবে তার স্বামীর কমলাকে দেখেই এত মনে ধরল যে সে তার মন-প্রাণ এই অসীম সৌন্দর্যময়ীর কাছে আত্মনিবেদন করতে দেরি করল না।

পাড়া গাঁয়ের শ্বশুরবাড়ি কমলার মোটেই ভালো লাগেনি বিশেষত শিবেশ্বরের প্রাসাদোপম বাড়ীর ঐশ্বর্য তার চোখে ঘোর লাগিয়েছিল কিন্তু তুলনা করা উচিত না হলেও মনের মধ্যে তুলনা একটা চলেই আসে। তবুও এ মনোভাব কমলা কাউকে বুঝতে দেয় না, ছোট দেবর-ননদদের নিয়ে খাওয়ানো, পান সাজা, ঘর-দুয়ার পরিস্কার রাখা এসব কাজ সে হাসি মুখে ক'রে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। স্বামী বিজয়ের কমলাকে পেয়ে নতুন মধুর অনুভূতি, তার মনের মানসীকে সে কমলার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। কমলা শুধু ভাবে মনকে বাঁধতে হবে, কারণ এই ঘর-সংসারই তার আপন ঘর। বিজয় পড়াশুনা করতে কোলকাতায় যায়। যাবার সময় নতুন বধূকে ছেড়ে যেতে স্বামীর যত কষ্ট হয়, বলাবাহুল্য তার বিপরীতে কমলার বিন্দুমাত্র কোন অনুভূতি হয় না। বিজয়ের যাবার পর কমলাও তার বাপের বাড়িতে চলে আসে। পুরু নীলাভ রঙের খামে আসা স্বামীর চিঠি কমলা সঙ্গিনীদের চাপে পড়ে দেখায় কিন্তু তার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই।

শিবেশ্বর-ধীরেনের আবার দেখা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। শিবেশ্বরের বড় শ্যালিকা সরোজা বম্বে থেকে তার স্বামী, খুকী সহ বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। শিবেশ্বরের অনুরোধে ধীরেন এসেছে

এদের সবার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাবে, কারণ শিবেশ্বর ধীরেনকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে শিবেশ্বর-ধীরেন ছাদে গিয়ে বসে। অন্য কেউ নেই সেখানে। শিবেশ্বরের অনেক কথা ধীরেনকে বলার ইচ্ছা, ধীরেন জানায় এরপর হয়তো তাদের আর দেখা হবে না। কারণ ধীরেন আসানসোলে প্রাকটিস করবে ঠিক করেছে। বোন কমলা সেখানে আছে একথা ধীরেন যখন জানায় তখন শিবেশ্বর যেন চম্‌কে ওঠে ঐ নাম শুনে। এরপর দুই বন্ধুতে যে কথা হয় তা শুধু কমলাকে কেন্দ্র করেই। ধীরেন কোনও একভাবে বোঝে কমলাকে না পেয়ে শিবেশ্বরের মনের গোপন কোণে কোথাও যেন একটা গভীর ক্ষত রয়েছে তাই হয়তো সে পড়াও শেষ করতে পারেনি। বিলেত গিয়েও তিনমাস হতে না হতেই সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। তবুও শিবেশ্বরের যে ধারণা ছিল কমলা এসব কথা জানে না এই ভুল ধারনা ধীরেন তাকে একসময় ভাঙ্গিয়ে দেয়, এবং ধীরেন বলে কমলা এসব কথা জেনে আঘাত পেয়েছে বলেই ধীরেন শিবেশ্বরকে ক্ষমা করতে পারেনি।

এদিকে কমলার স্বামী বিজয়নাথের পিতার স্বর্গবাস হয়েছে, পিতা প্রচুর ধার দেনাও করেছেন, বিজয় যেন খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, সে এসময় স্ত্রীর সাহচর্য একান্তভাবে কামনা করেছিল কিন্তু কমলা সেই আগের মতই মৃদুভাষী, নিরুত্তাপ। শুষ্কভাবে কর্তব্যই করে যাচ্ছে। বিজয়ের আজ বহুদিনের কথা মনে পড়ছে, ফটোতে কমলাকে প্রথম দেখা, তারপর বিবাহ, প্রথম মোহাভিভূত অবস্থা এমনকি প্রথম প্রথম কলেজে যেতেও বিজয়ের চোখে জল আসত কিন্তু ধীরে ধীরে বিজয়ের চোখে ধরা পড়ে যে তার স্ত্রী কর্তব্যনিষ্ঠ রমনী হলেও স্নেহবিহ্বল তরুণী নয়। নারীর কাছে পুরুষ তো কর্তব্যের উপদেশ চায় না, চায় এমন একটা কিছু যাতে অহরহ কর্তব্যের নিশান দিহি নেই বটে কিন্তু যা পেলে চিন্তা, কার্য, এবং মনন শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সে জিনিস হল প্রেরণা। এ বিজয় কমলার কাছে পায়নি কারণ কমলা তো শুষ্ক কর্ত ব্যই করে এসেছে, অন্তর দিয়ে সে ভালো বাসেনি।

ইতিমধ্যে হরিদা আসে কমলার শ্বশুরবাড়িতে। রোগ-শোক-ঝামেলা-ঝক্কিতে কমলার হরিদাকে দেখে অভিমান ক্ষুব্ধ মন অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। হরিদা যখন কমলাকে বলে শ্বশুবাড়িতে স্বামীর সঙ্গে নিজেকে সে মেলাতেপারছে না তাই সে এমন নিঃসঙ্গ, ছন্নছাড়া হয়েপড়েছে তখন কমলা বলে — শুধু সে নয় বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সব মেয়েরই যখন বিয়ের সময় হয় তাদের কেউ কখনো প্রশ্ন করে না যে কেমনটি হলে তারা ঠিক সুখী হবে।

কমলার স্বামী বিজয়ের বেশ সর্দ্দি- বুকের কাছে ব্যথা। কমলা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায়, হরিদা ডাক্তারের খোঁজে রাণীগঞ্জে যায়। ভয়ে বিবর্ণ কমলা তাড়াতাড়ি বিজয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে তখন ঘোষণা করে যে তার জীবনের এখন থেকেই শুরু হল নূতন অধ্যায়। বোঝা যায় কমলা এবার প্রাণপণে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে চেষ্টা করবে তার স্বামী - সংসারকে।

'ক্রন্দসী'—

আশালতা সিংহের লেখা এই উপন্যাসের নায়িকা ইভা। ইভা কলেজে পড়ে। শহরে থাকে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সে বায়োস্কোপও দেখে। পিতা নিশানাথ, মা-মাধুরী দেবী। নিশানাথ দু বছর ধরে মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন, কিছুতেই মনের মতো পাত্র পান না। অনেক খুঁজে পেতে যাও বা এটি পেয়েছেন ছেলের বাড়ি গ্রামে বলে মাধুরী দেবীর কিছুতেই মন সায় দিচ্ছে না। রাত্রি একটার সময় স্বামী-স্ত্রীতে এই নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে মেয়ে ইভার কানেও এসব আলোচনা গিয়ে পৌঁছায়। ভয়ে ভাবনায় ইভার রাতে ঘুমাতেই দেরি হয়ে যায়। পাত্রের বাবা পাত্রী দেখতে আসবেন তাই ইভার কলেজ যাওয়া যেমন বন্ধ হয় তেমনি বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও সে বায়োস্কোপ দেখতে যেতে পারে না। পাত্রের পিতা কুমুদনাথ অত্যন্ত সাদা সিধে কাপড় পরা ইভাকে দেখে যার-পরনাই মুগ্ধ, বিশেষত ইভার সাদা সিধে পোশাকে তার রুচিরও প্রশংসা করেন তিনি। ইভা কিন্তু ভিতরে ভিতরে যথেষ্টই কন্টকিত; পাড়া-গাঁকে সে অশিক্ষিত-অসভ্য লোকের বসবাস করার জায়গা বলেই ভাবে। মা মাধুরী দেবীর প্রথমে আপত্তি থাকলেও পরে সেটা কেটে যায় বোঝা যায় নিরুপায় মা স্বামী এবং সমাজের চাপে মেয়েকে গ্রামে বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছেন।

ইভা কুমুথনাথকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। কুমুথনাথ তাকে একজোড়া ভারী সাবেকি বালা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কুমুদনাথ যখন বলেন যে পাড়াগাঁয়ে বিয়ের পর থাকতে হবে ভেবে ইভা ভয় পাচ্ছে কিনা তখন ইভা তার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে যে সব রকম পরিবেশে মানিয়ে চলার জন্য মেয়েদের প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। যদিও ইভা রাতভর অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও অত্যন্ত ভয় মিশ্রিত ক্রোধান্বিত অবস্থায় ছিল এবং শুধুমাত্র বয়স্ক লোকের মুখের ওপর বলা ঠিক নয় ভেবেই সে নিজেকে সংবরণ করে যা লোকে শুনতে ভালোবাসে তেমন কথাই বলে। কিন্তু কুমুথনাথবাবুও এ কথায় সায় দিয়ে বলেন যে, ''হ্যাঁ মেয়েদের একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে, যার বলে তারা বিভিন্ন সময় জীবনের সকল রকম অবস্থা বিপর্যয়ের সঙ্গেই নিজেদের চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারে।''[৬০] তার কারণ তারা সভ্যতার শতদলের মর্মস্থানে ফুটে রয়েছে। পুরুষরা তাদের তুলনায় বর্বর।

কুমুদনাথবাবুর এই উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়, মেয়েদের দেবী-মহৎ কিছু বানিয়ে যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। নিজেদের সমস্ত রকম সুখ সুবিধা বলি দেওয়াতেই মেয়েদের জীবনের সার্থকতা — এ তত্ত্বটি কীভাবে তাদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

যদিও কুমুদনাথ বাবুর মিষ্টি ব্যবহারে ইভা বেশ আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে পাড়া গাঁ হলেও যে ঘরে সে বিয়ের পরে যেতে চলেছে সে বাড়ির কর্তাটি ভদ্র-মিষ্টভাষী। ইভার এই মুখের ভাবে তার মা

মাধুরী দেবীও বেশ হাল্কা বোধ করেন।

বিবাহ হয়ে গেছে। পরের দিন সকাল থেকেই শানাই বাজছে। তোরণ দ্বারে মঙ্গল কলস রাখা আছে। এগুলি আশালতার উপন্যাসের অতি পরিচিত অনুষঙ্গ।

তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রায় সব নায়িকারই প্রিয় রঙ বোধ হয় নীল। তা কখনো ঘন নীল হয়, কখনো ফিরোজা রঙ হয়, কখনো আশমানি হয়। সেই সঙ্গে তারা সকলেই হাল্কা গহনা পড়তে ভালোবাসে। পোশাকে-অলংকারে, সাজ-গোজ চালচলনে আধুনিক রুচির ছাপ তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়।

ইভার খুড়তুতো বোন কমলা এবং তার কলেজের বান্ধবীরা ইভাকে সাজানোর ভার নিয়েছে। তারা ইভাকে বেনারসী না পরিয়ে ঘন নীল রঙের পাতলা শিল্কের শাড়ী পরাল, মাথায় খোপা না করে দীর্ঘ-বেণী ঝোলাল , বেছে বেছে কয়েকটা হালকা গহনা, কাজল, টিপ সহযোগে সাজ যখন সম্পন্ন হল তখন ইভার দিদিমা এই সাজ দেখে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন যে এ ধরনের সাজে পাড়াগাঁয়ের শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হলে সেখানকার লোক হাসাহাসি করবে। এ সাজ দেখে ইভার শ্বশুর কুমুদনাথবাবু অবশ্য প্রশংসাই করেন কিন্তু গ্রামে উপস্থিত হলে দেখা যায় ইভার দিদিমার আশঙ্কাই সত্যি — সেখানে ইভার বাঁকা সিঁথি, বেণী ঝুলাবার বহর দেখে পাড়া পড়শি সহ কিছু আত্মীয় কুটুম্বরাও হাসাহাসি করে।

ইভা খুব ভালো সংকল্প নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে টের পেল — ''কথায় আদর্শবাদ খাড়া করা এক জিনিষ আর পল্লীগ্রামে অন্তঃপুর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বস্তু।''[৬১]

বিয়ের কয়েকমাস পর ইভা কোলকাতায় বাপের বাড়ি এসেছে। তার স্বামী শশাঙ্ক কোলকাতায় মেসে থেকে ল'পড়ছে। শনিবার করে শশাঙ্ক শ্বশুরবাড়িতে আসে ইভার সঙ্গে দেখা করতে। শশাঙ্ক-ইভা গল্প করে, লেকের ধারে বেড়ায়। পাড়া গাঁয়ে বিয়ে হলেও স্বামীকে নিয়ে ইভা সুখী।

ইতিমধ্যে ইভার বান্ধবী রেবা আস ইভার সঙ্গে দেখা করতে। এই রেবা তার স্বামী মিস্টার মুখার্জীকে বাড়ির অমতে 'লাভ ম্যারেজ' করেছিল। আজ সে রেবাই আবার তার স্বামী থেকে দূরে সরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। রেবার মতে ''একদিন বিয়ে করেছি সানন্দে স্বেচ্ছায়। কিন্তু তাই বলে যে চিরজন্ম বাঁধা দিয়েছি তার তো কথা হয়নি।''[৬২]

ইভার সামনে একদিকে ছিল তার শ্বশুর বাড়ির পাড়াগ্রামের মানুষদের এঁদো কূটকাচালি স্বামী সন্তান আঁকড়ে একঘেয়ে জীবন যাপনের চিত্র অন্যদিকে শহুরে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী রেবার মত মেয়ের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্য স্বামীকে ছেড়ে দূরে চাকুরী করতে যাওয়া।

রেবার এই পরিবর্তন দেখে ইভার মনেও প্রশ্ন জাগে — জগতে সমস্ত বস্তুই যেমন ক্ষণস্থায়ী, প্রেমও কি তাই। ইভা প্রেম নিয়ে ভাবিত হলেও তার স্বামী শশাঙ্ক কিন্তু যথেষ্ট বাস্তববাদী। সে বিলেত যাবে। সে জানে শুধু ভাব-বিলাস চর্চার কোনো মূল্য নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে অর্থের যে যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে তা শশাঙ্কই ভালোই অনুভব করে।

বিলেত যাবার আগে স্বামী সহ ইভা আবার তার শ্বশুরবাড়ি গ্রামের বাড়িতে আসে। কারণ তার শ্বশুরের ইচ্ছা ইভা তার স্বামীর বিদেশ থাকাকালীন শ্বশুরের বাড়িতেই থাকে। এরজন্য ইভার শ্বশুর ইভাকে চিঠি দিয়ে গ্রামে আসার জন্য লেখেন সেই সঙ্গে এও বলেন যে গ্রামের মানুষদের সে যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। কারণ গ্রাম সংস্কার করতে হবে কিন্তু লেশতম গর্ব না রেখে।

শ্বশুরের চিঠি পেয়ে ইভাও অত্যন্ত ভালো সংকল্প নিয়ে গ্রামে আসে। গ্রামের ইন্দু মেয়েটির সঙ্গে ইভার আগেই পরিচয় হয়েছিল। ইন্দু ইভাকে তার বাড়ি যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানায়।

ননদ উমা চা করলে সেই চা ইভা তার স্বামী শশাঙ্কের জন্য নিয়ে যায় যেখানে শশাঙ্ক তার মা এবং পাড়ার কিছু বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে বসে ছিলেন। ইভার সকলের সামনে স্বামীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, চা দেওয়া - পাড়াগ্রামে রীতিমত নিন্দা ও হাসাহাসির খোরাক হয় যা ইভার শাশুড়ীর ভালো লাগে না।

ইভারও এ ধরনের গ্রাম্যতা সহ্য হয় না, তার মতে সকল সময় কে কি ভাবল তাই মনে করে চলা অসম্ভব। শশাঙ্ক তার স্ত্রী ইভাকে বোঝায়, বলে —'তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়। সেই জোরেই দিন কাটবে। সমস্ত ভয় আপনি ভেঙে যাবে।'[৬৩] আবার সেই মহৎ বানিয়ে তার ভেতরের বোধ বুদ্ধিকেচাপা দেবার চেষ্টা।

ইভা যদিও বলে ''ওসব বড় বড় কথা আমিও ঢের জানি। ওতে এখানে কিছু ফল হয় না। ... আছে শুধু একটানা অন্ধকার।''[৬৪]

ইভা যতই তার স্বামীর স্বদেশ প্রীতি, গ্রাম প্রীতির জন্য গর্ববোধ করুক মনে মনে তারই ইচ্ছা ছিল — সে শহরে বড় চাকুরের গৃহিনী হবে। সুখ-সমৃদ্ধি-স্বাচ্ছন্দ্য আধুনিকতায় মোড়া হবে তার জীবন।

ইভার এ কল্পনা বড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তার স্বামী তাকে সেন্টিমেন্ট দিয়ে মহিয়সী বানিয়ে তুলতে কসুর করে না - শশাঙ্ক বলে — ''..কিন্তু তোমার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় না, সাধারণ মেয়েদের মত কেবল সুখই তোমার একমাত্র কাম্য।''[৬৫]

ইভাকে তাই আবার আদর্শবাদ অবলম্বন করেই খাঁড়া হয়ে উঠতে হয়।

ইভা যখন শশাঙ্কের বিলেতে গিয়ে চাকরীর জন্য নয় ব্যবসার জন্য কোন একটা ব্যবসা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে বিলেত যাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তখন শশাঙ্ক জানায় যে, তার কোন এক দূর সম্পর্কের দাদামশাইয়ের উইলের শর্ত অনুযায়ী বড় চাকুরী নিয়ে শহরে নয় এই গ্রামেই তাকে এবং তার পিতাকে বসবাস করতে হবে। কেননা সেই দাদা মহাশয় সারাজীবন বিশাল বড় চাকুরী করে, শহরে জীবন কাটিয়ে এমনকি বছরের বেশ কয়েকমাস তার বিদেশেও কাটত, সেই দাদামশায়ের জীবনের শেষ সময় তার জন্মভূমি গ্রামের জন্য কিছু করার কথা ভাবেন। তাই তার কিছু সম্পত্তি গ্রামের বাড়ি উইল করে যান শর্ত সাপেক্ষে।

শশাঙ্ক চলে গেলে গ্রামে ইভার অখন্ড অবসর। সে দুপুরবেলায় তার ননদ উমাকে নিয়ে ইন্দুর কাছে যায়। গিয়ে দেখে ইন্দুর শাশুড়ি পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। রান্না করা, খেতে দেওয়া, দুপুরে খেয়েই তেঁতুল ছাড়ানো, গোরুর জাবনা দেওয়া - গোবর দেওয়া - সন্ধ্যা দেওয়া, গৃহকর্মের যাবতীয় কাজ ইন্দু একা হাতে সামলাচ্ছে তবু যদি স্বামী শাশুড়ির তরফ থেকে একটু ভালো ব্যবহার সে পেতো। স্বামী অত্যাচারী লম্পট, শাশুড়িও তেমনি মিথ্যেবাদী, অত্যাচারী।

ইভার শ্বশুরবাড়ির লোকজন উদার হলেও গ্রামের লোকেরা কিন্তু তাকে নিয়ে গবেষণা করার কোন খামতি রাখে না।

উপন্যাসের ৫১ পৃষ্ঠায় দেখি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে হোলিতে মন্দিরে খোল করতাল সহযোগে কীর্তন হচ্ছে —

'আজ কানাইয়া লালে লাল, হোলী খেলে মদনগোপাল।''[৬৬]

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে হোলি উৎসবে খুব ঘটা করে পূজো হয়। শশাঙ্কের ল' পড়া শেষ হয়েছে। এবার সে ব্যবসা শিখতে বিদেশ যাবে। শশাঙ্ক বিলেত যাবার আগে আবার গ্রামে এসেছে। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে স্ত্রী ইভাকে নিয়ে শশাঙ্ক কোকলতায় রওনা হয়। ইভা শশাঙ্ককে বোম্বে পর্যন্ত গিয়ে জাহাজে রওনা করিয়ে ফিরে আসে।

গ্রামে হোলির দিন আবার কীর্ত্তনীয়াদের গান কানে এল —
আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী।।
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে
সুরধ্বনি ধারা বহে অরুণ নয়নে...

এর হরিবোল, হরিবোল ধ্বনির মধ্য দিয়ে সেই কীর্তনের সভা ভাঙে। চৈতন্য মহাপ্রভুও কতযুগ

আগে এই ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামের মেয়েরা চিকের আড়ালে বসে এই কীর্ত্তন শুনছিল। এদের দিকে তাকিয়ে ইভার রাগ হল না, করুণা হল। বাইরে কীর্ত্তনীয়ারা গেয়ে গেয়ে প্রণাম করছিল এই বলে —

মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা।
নয়ানে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল পারা।
জলের ভিতর ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরা চাঁদ হৈল পারা।।

অনেক রাতে যখন ইভা চেয়ারে এসে বসে তখন রাস্তা দিয়ে একটি ধান বোঝাই করা গরুর গাড়ির গাড়োয়ান মেঠো সুরে ভাঙা গলায় গান করতে করতে চলেছে। শশাঙ্ক বিলেতের পথে রওনা হলে ইভা কোলকাতায় কিছুদিন তার মা-বাবার ঘরে থাকবে।

শশাঙ্ক বিলেত থেকে ফিরে এসে তাকে তার পল্লীসমাজ হয়তো সহজে নেবে না এটা জেনেও শশাঙ্কের গ্রামপ্রীতি নিয়ে স্ত্রী ইভা কটাক্ষ করলে শশাঙ্ক বলে —

> ''কেন জান না কি, যারাই সাধারণ পথ ছেড়ে চিন্তা কার্য বা যে কোনভাবেই
> হোক আপন আদর্শ অনুযায়ী চলতে চায় তাদের সহ্য করতে হয় অনেক।''[৬৭]

একথাই প্রমাণ করে শশাঙ্ক আদর্শবাদী পুরুষ, সাধারণ মানুষের মত তার চিন্তাধারা নয়।

কোলকাতায় আসার আগে ইন্দুর অনুরোধে ইভা ইন্দুদের বাড়িতে যায়। সেখানে দেখে ইন্দুর স্বামীর অসুখ, ইন্দু এই অবস্থায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করছে। লম্পট স্বামীর জন্য ইন্দুর এই দুশ্চিন্তা দেখে ইভা রীতিমত অবাক হয়। আবার ইন্দুর শাশুড়ী ভ্রষ্টা হেমশশী রাধুনিকে ডাকিয়ে এনে পুত্রের কাছে তার সেবা করার জন্য বসিয়েছেন। উদ্দেশ্যটা সহজেই অনুমেয় তবুও ইন্দু স্বামীর আরোগ্য কামনা করে।

ইভার মনে পড়ে, তার বান্ধবী রেবার কথা যে আত্মমর্যাদায় আঘাত পাওয়াতে স্বামীর থেকে সরে দূরে চলে যেতে চেয়েছে। ইভা ভেবে পায় না রেবার এই আত্মাভিমান ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে বাহবা দেবে না কি ইন্দিরার মত সহনশীল স্বর্বংসহাকে ভাল বলবে?

আশালতা এ বিচারের ভার পাঠকের ওপরই ছেড়ে দেন।

কোলকাতায় ইভা সূর্যাস্ত দেখতে বাড়ির ছাদে ওঠে কিন্তু গ্রামে থাকতে দীঘির পারে দাঁড়িয়ে শ্যামল মাঠ, সূর্যাস্ত দেখার যে আস্বাদ তার তুলনায় এই কোলকাতায় সূর্যাস্ত ফিকে। গ্রামে প্রকৃতির যে রূপ তা শহরে পাওয়া মুস্কিল তা জেনেও গ্রাম শহরের যে রূপ তা তুলনা করে গ্রামের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা

প্রমাণ ক'রে ইভা কি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চায় যে চিরকাল ইচ্ছা করলেই সে নির্মল প্রকৃতি, সূর্যাস্ত দেখতে পাবে কারণ তার শ্বশুর বাড়ি অজ পাড়া গাঁয়ে এবং তার স্বামী সহ তাকে গ্রামেই থাকতে হবে।

ইভার বান্ধবী অরুণা, করুণা — এরা যখন শহরে থেকে, শহরের সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে জীবনকে উপভোগ করছে তখন ইভা ভাবছে গ্রামের কথা।

রেবার সিনেমায় নামা, একাকী স্বাধীন জীবন যাপন দেখেও ইভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। ইভার এদেরকে দেখে যতই মনে হচ্ছে যে এরা অনৈতিক কাজকর্ম করছে ততই আমাদের তথা পাঠকের মনে সন্দেহ বাড়ছে ইভা সাধারণ মানুষের মত নয়। তার মনে গ্রাম সংস্কারের সমাজ সংস্কারের রোখ চেপে বসেছে। এটা হয়েছে তার স্বামী, শ্বশুরের কথাতেই। ইভার মন যদি ছোট থেকে কিংবা গ্রামে গিয়ে দেখে শুনে স্বাভাবিক ভাবে যদি তার গ্রাম সংস্কারের ইচ্ছা জাগত তাতে বলার কিছুই ছিল না। কিন্তু এ প্রীতি যত না আন্তরিক তার চেয়ে অনেক বেশি স্বামী-শ্বশুরের মুখ চেয়ে।

শশাঙ্ক বিলেত গেছে। কোলকাতায় ইভার এক যাতে খারাপ না লাগে তার জন্য মা মাধুরীদেবী ইভাকে জোর করে ইভার খুড়তুতো বোন, সহ তাকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে দেয়। সিনেমা হলে গিয়ে দেখে অত্যন্ত ভিড়। যারা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তাদেরই জন্য বেশি ভিড়। ইভা ভাবে যে সারাদিন কায়িক পরিশ্রম করে সামান্য রোজগার করে সেও তার আয়ের একটা অংশ দিয়ে ঘন্টা দুই রোমান্টিক আবহাওয়ায় কাটাতে এসেছে।

এরই মধ্যে এদিন ইভা একদিন ছোট দাদা সুবোধের সঙ্গে ইউনাভির্সিটিতে সেমিনারে গেল। সেখানে দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভূতপূর্ব ভাইসচ্যান্সেলর-এর বক্তৃতা শুনল, বক্তা অত্যন্ত সাধাসিধে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা রাখেন যা শুনে ইভা সহ অনেকেই মুগ্ধ। তিনি বলেন দেশের তথা গ্রামের চাষী মজুররা অনেকেই এখনও নিরক্ষর, দেশের উন্নতি করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষার আলোয় আনতে হবে।

সুবোধ ইভার কাছে প্রস্তাব দেয় যে সুবোধ ইভার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়ে শিক্ষাদানের মতো মহৎ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়।

ইভা এ ব্যাপারে সুবোধকে নিরুৎসাহ না করলে এই বলে সাবধান করে যে গ্রমবাসীর উপকার করা খুব সহজ নয়। যাদের উপকার করবে বলে গ্রামে যাওয়া তারাই অনেক সময় ভুল বোঝে, মন্দ কথা বলে, সেসব সহ্য করা খুবই কঠিন।

তবুও নাছোড়বান্দা সুবোধ কলেজের গরমের ছুটিতে ইভার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। ইভার দেওর অবনীও এ সময় ছুটিতে বাড়িতে ছিল কাজেই সুবোধের সাথে সেও গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই সুবোধ উপলব্ধি করে ইভার

সাবধান বাণী কতাখানি সত্যি।

শশাঙ্কের চিঠি এসেছে। সে বিলেতে গিয়ে একটি বিষয় উপলব্ধি করেছে, তা হল — সেখানে শুধু কাজ আর কাজ। আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে মানুষের সময় বড় কম তাই সেখানকার লোকেরা যেন স্বপ্ন দেখে না, তাদের যেন মন নেই।

রাতে ইন্দিরার ঘুম আসতে চায় না গ্রামে বসবাসকারী অত্যাচারিতা ইন্দিরা, ভয়ার্ত হরিদাসী, রায়দের বাড়ির বাচ্চা বয়ে বেড়ানো ন'বছরের অসহায় মেয়েটার কথা ভেবে। এর উপরে আবার গাঙ্গুলী বাড়ির বড় বৌ এর শোচনীয় মৃত্যু তাকে অসম্ভব দুঃখ দেয়। গ্রামে মানুষের বিশেষত মেয়েদের দুর্গতি যে কী বীভৎস পর্যায়ে রয়েছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। মেছেনী তার ছেলের চোখ নিজে হাতে কুলের কাঁটার খোঁচা দিয়ে অন্ধ করে দেয় অজ্ঞতা বশত।

শশাঙ্ক আবার লিখেছে যে সে যখন জার্মানে যায় সেখানকার কুলি মজুরদের সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' বইটি নিয়ে আলোচনা করতে দেখে মুগ্ধ হয় সে।

গাঙ্গুলী বাড়ির বউ এর মৃত্যুর জন্য তার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন যে কতখানি দায়ী তা ক্ষেমী ঝি যখন বিশ্লেষণ করে তখন ইভা শ্লেষের সঙ্গে বলে যে —

> ''...ভদ্রলোক বাইরে ছুটে বেড়িয়ে যদি স্ত্রীকে রেহাই দিতেন তবু সে বেচারা আরও কটা দিন বেঁচে থাকতে পারত।''[৬৮]

এ প্রসঙ্গে আশালতার 'দুই নারী' উপন্যাসে সরোজের কথা পাঠকের মনে পড়বে। জন্মভূমি গ্রামকে উপেক্ষা করা নিয়ে বিনোদ উমাকে কটাক্ষ করলে উমা বলে —

> ''যা মরে গেছে তাকে কি জোর করে শুধু সেন্টিমেন্টের খাতিরে বাঁচানো যায় বৌদি? পল্লীসমাজ মরে গেছে। এই দেশব্যাপী শবের উপর তোমরা দু'একজন বসে কিসের সাধনা করবে। তোমাদের পালাতে হবে এর পচাগলা গন্ধে।''[৬৯]

শেষ পর্যন্ত ইভা এবং শশাঙ্ককে পালাতে হয় কিনা তাদের গ্রাম ছেড়ে সে খবর পাঠক পায় না। তবে শশাঙ্ক আসা পর্যন্ত ইভা খুব মন শক্ত করেই গ্রামে থেকেই স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে, সংকল্প করে গ্রামে থেকেই গ্রামের উন্নতি করবে তারা। এখানেই উপন্যাসের শেষ।

‘কাঞ্চন দীঘির মেয়ে’ —

আশালতা সিংহের লেখা এই উপন্যাসটি ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের নায়িকা কাজল। কাজলের দাদা নিবারণ, পিতৃমাতৃহীন কাজলের একমাত্র অবলম্বন তার দাদা। ধনী ঘরের ছেলে অবণীর সঙ্গে নিবারণের পরিচয় হয়, অবণী কাঞ্চনকে পছন্দ ক’রে তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য নিবারণের কাছে প্রস্তাব দেয়। অবণীর এই প্রস্তাবে নিবারণ সানন্দে রাজি হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে অবণীর বিয়ে হয় ধনী বাড়ির মেয়ে জয়শ্রীর সঙ্গে। অসুস্থ নিবারণ অবণীর সন্ধান করতে কোলকাতায় যায়, কোলকাতাতেই নিবারণ মারা যায়। কাজল একমাত্র দাদাকে হারিয়ে অত্যন্ত হতাশ, বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় কোলকাতায় এসে উদার যুবক সুধীরের সান্নিধ্য লাভ করে। সুধীরের মধ্যে নিজের দাদাকেই যেন খুঁজে পায় কাজল।

এদিকে অবনীর স্ত্রী জয়শ্রী একসময় সুধীরকে ভালোবাসতো। বিয়ের পর জয়শ্রী নিজের ভুল বুঝতে পেরে পূর্ব প্রেমিক সুধীরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অবণীও নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কাজলকে তার যোগ্য মর্যাদা দিয়ে বিয়ে করে।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় অবণী এবং তার স্ত্রী কাজলের উদ্যোগে কাঞ্চনদীঘি গ্রামের মানুষের জন্য বালিকা বিদ্যালয়, বালক বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি প্রাসাদ কাজলের দাদা নিবারণের নামে এবং অতিথিশালাটি সুধীরের নামে উৎসর্গীত হয়েছে। কাঞ্চনদীঘির মানুষের জয়ধ্বনিতে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই উপন্যাসটি আদৌ আশালতা সিংহের লেখা কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক, গবেষক ড.তপোব্রত ঘোষ মহাশয় বলেন, উপন্যাসটি আদৌ আশালতা সিংহের লেখাই নয়।

‘স্বয়ম্বরা’ —

আশালতা সিংহের লেখা এই উপন্যাসের নায়ক বিনয়। বিনয় কোলকাতারই একটি মেসে থেকে কলেজে পড়ে; এবার সে বি এ পরীক্ষা দেবে। একদিন হঠাৎ তার সাঁইথিয়ার কাছে পল্লীগ্রামের বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল যে তার বাবা অসুস্থ, সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি তার বাড়ি পৌঁছানো প্রয়োজন।

ট্রেনে রওনা দিয়ে বিনয় গ্রামের প্রান্তে পৌঁছে বাকি পথটা গরুর গাড়িতে করে অত্যন্ত কষ্টে বাড়িতে পৌঁছায়। বিনয়দের গ্রামে কেবল একটা মাইনর স্কুলই রয়েছে তাই বহুদিন থেকেই বিনয় লেখা-পড়ার জন্য বাইরে বাইরেই থেকেছে। বাইরে থাকার দরুণ সে বাড়ি এবং বাড়ির লোকজনের অবস্থা সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহালও নয়।

বিনয় আসার পর অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও বিনয়ের পিতাকে বাঁচানো গেল না। এই প্রসঙ্গে লেখিকা ডাক্তার শরৎবাবুর মধ্য দিয়ে পয়সার প্রতি ডাক্তারদের লিপ্সার চিত্রটি একদিকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিকভাবে গ্রামের মানুষের রোগীর ঘরে ভিড় করা এবং লোক দেখানো দুঃখের ভান করা প্রভৃতিও তুলে ধরেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর বিনয় তখনই আর কোলকাতায় যেতে পারে না। সে ঠিক করে সে আর পড়বে না, চাকরীর চেষ্টা করবে। কারণ সাংসারিক অবস্থা তাদের মোটেই ভালো নয়। কিছুদিন গ্রামে থেকে সে কোলকাতা থেকে বন্ধুদের মাধ্যমে বই আনিয়ে কিছু বাইরের বই পড়ে সময় কাটাবার জন্য।

বিনয়ের বোন নীহার। নীহারের বান্ধবী মালতী। বিনয়ের কাছে কিছু বাংলা গল্প-উপন্যাসের বই ছিল। মালতী ভীষণ বই পড়তে ভালোবাসে। এই বই পড়ার নেশার জন্য সৎ মা'র কাছে তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়; তার পিতাও তাকে পড়তে বারণ করে। কিন্তু বেশ কিছুদিন মামার সান্নিধ্যে থেকে লেখাপড়া শিখে মালতীর এমন পড়ার নেশা হয়েছিল যে শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সে পড়ত।

বিনয় চাকরীর সন্ধানে কোলকাতায়, পুরোনো মেসেই ওঠে। মেসে বন্ধুদের সান্নিধ্যে সে পুরোনো দিনের আবহাওয়া অনুভব করে কিছুক্ষণের জন্য। সেই পুরোনো তর্ক-আলোচনা। বিনয়ের বন্ধু নির্ম্মল, যতীন, শরদিন্দু প্রমুখ। শরদিন্দু তার বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে বলে —

> ''আমরা শিল্পীর সঙ্গে তাঁর জীবন-শিল্পকে কবর সঙ্গে তার কাব্যকে, কর্ম্মীর সঙ্গে তার নৈতিক জীবনকে অঙ্গাঙ্গীভাবে দেখতে অভ্যস্ত।''[৭০]

এ বক্তব্য হয়তো লেখিকা আশালতারও। তাই আশালতার লেখা গল্প-উপন্যাস- প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে লেখিকার জীবনকেও মিলিয়ে পড়তে হবে। আর এ থেকেই উঠে আসবে আশালতার মানসিকতা তার মনোভাব যা বুঝতে আজকের পাঠক গবেষক খুবই উৎসাহী।

বিনয় চাকুরীর জন্য নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি শুরু করল। সে তার পিতার পরিচিত ধনী যোগীন্দ্রবাবুর প্রসাদের মত বাড়ির বাইরের ঘরে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছে। যোগীন্দ্রবাবু তাকে উপদেশ দিয়েছে — এরপর বিনয় আবার বি.এ পড়া শুরু করে। বিনয়কে পড়াতে গিয়ে ভাই অতুলকে স্কুল থেকে নাম কাটাতে হয়। কারণ তাদের আর্থিক অবস্থায় দু'ভাইকে পড়ানো সম্ভব নয়।

গ্রামে নীহার-মালতীরা বিনয়ের পাঠানো খবরের কাগজের জন্য হাঁ করে থাকে। মালতী বহুদিন প র্যন্ত কোলকাতায় তার মামার সান্নিধ্যে থেকে শহরের স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। সে সময় থেকেই সে রুচিশীল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মামার পরলোকগমনে তাকে সৎমায়ের সান্নিধ্যে গ্রামে থাকতে হচ্ছে। গ্রামে থাকার সুবাদে গ্রাম্য এঁদো কূট কাচলি যেমন তাকে দেখতে হয়েছিল তেমনি গ্রামের লোকেরা যে কতটা অজ্ঞ সেটাও সে স্বচক্ষে দেখে। মালতীর মনে হয় — ''শুধু সে নিজেই নয়, সমস্ত লোকেই যেন নিষ্ক্রিয়তায়, জড়তায়, অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।''[৭১]

কিন্তু দুটো টিউশুনি জোগাড় করলেও আত্মসম্মানে আঘাত পাওয়ায় একটা টিউশুনি ছেড়ে দেয়। কিন্তু আর্থিক অনটনে সে উপলব্ধি করে রাগের মাথায় কাজটি ছাড়া তার মোটেই উচিত হয় নি।

বিনয় যখন তার বি.এ পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরল তখন সে বাড়ি ফিরে দেখে বাড়ীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। বিনয় বাড়ি আসাতে বাড়ির সকলে আশা করেছিল তাদের দুঃখের দিন হয়তো কাটবে।

বিনয়কে সকলের আশা আকাঙক্ষার কথা ভেবে সে একটু ভয়ই পেল কারণ চাকুরী যোগাড় ঐ বাজারে যে অত্যন্ত কঠিন তা বাড়ির অন্যান্যরা না জানলেও বিনয় খুব ভালো করেই জানে।

বিনয় এবার কোলকাতা থেকে আসার সময় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্য এবং 'শিশুভারতী' নামের কয়েকটি মাসিক পত্রিকা এনেছে বোন নীহার এবং তার বান্ধবী মালতীর জন্য।

মালতী কিছুদিন আগে পর্যন্ত মামার সান্নিধ্যে কোলকাতায় লেখাপড়া শিখেছিল এখন গ্রামে পিতার কাছে থাকলেও তার সুকুমার মনটি একই আছে তাই সে কোন বই পত্রিকা পেলে অধীর আগ্রহে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিনয়ের মুখে আবৃত্তি শুনে মালতী ভাবে — কত অন্ধকারে তারা রয়েছে।

গ্রামের বয়স্ক পরেশ খুড়ো বাড়ি বয়ে এসে বিনয়কে উপদেশ দেয় তার বোন নীহার যেন মালতীর সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করে কারণ পরেশের মত মালতী মেয়েটি অত্যন্ত বেহায়া, ডেপো, পাকা, নষ্ট মেয়ে। এমন বয়স্ক লোকের মুখে এ ধরনের কথা শুনে বিনয় অবাক হয়ে যায়। আসল কথাটা বোন নীারের মুখে শুনে বিনয়ের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। নীহার জানায় — বছর খানেক হল পরেশ খুঁড়ার স্ত্রী মারা গেছে। ছেলে পিলে, মেয়ে জামাই বাড়ি ভর্তি হলেও পরেশ খুড়া ঘটক পাঠিয়ে মালতীর সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব করে। মালতীর এতে ঘোরতর আপত্তি থাকায় পরেশ মালতীর ওপর এখন অত্যন্ত খাপ্পা। একথা শুনে বিনয় ভাবে

'বাঙ্গালা দেশের মেয়ে হইয়া জন্মানো কি এতই অপরাধ!'[৭২]

বিনয় কেলাকাতায় চাকুরীর সন্ধানে চলল। ধনী যোগীনবাবুর ভরসায় থাকলে যে হবে না সেটা খানিকটা আন্দাজ করেই বিনয় সর্বত্র চাকুরীর চেষ্টা চালাতে লাগল। বিনয় কোলকাতার একটি গলির ভিতরে দোকানে কাজ জোটালো সামান্য বেতনে। একমাসের মাইনার টাকা সে অগ্রিম পেয়েছে।

সোনাজোড়া গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে নীহারের বিয়ে ঠিক হয়। পাত্রপক্ষকে দেখে বিনয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। সর্বত্র একটা নির্বুদ্ধি এবং স্থূলরুচির পরিচয়।

অতুল এবং বিনয়কে পাশাপাশি বসিয়ে মা রত্নময়ী খাবার পরিবেশন করছেন, বহুদিন পর তাদের বাড়িতে এইদিন খাওয়া দাওয়ার বিশেষ আয়োজন হয়েছে। রত্নময়ী খেদের সঙ্গে বলেন অতুলটা একেবারে বকে গেছে, তাকে পুনরায় তিনি স্কুলে ভর্তি করে দিতে চান কিন্তু অতুল রাজি হয় না। বিনয় অতুলকে কোলকাতার কোন স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কথাও বলে। কিন্তু অতুলের বকাটে ছেলেদের সঙ্গে ঘোরায়েরাতেই আনন্দ। বোন নীহারের যেখানে সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে তা বিনয়ের পছন্দ হয়নি কারণ ওরকম অশিক্ষিত অরুচিকর পাত্র এবং পাত্রের পরিবার বিনয়ের একেবারেই ভালো লাগেনি। কিন্তু বিনয়ের এ আপত্তি ধোপে টেকে না। কারণ —

> ‘‘একটা মানসিক রুচি বিলাসকে প্রাধান্য দিয়া এই সস্তার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া ষোল সতের বছরের কুমারী মেয়েকে লইয়া পল্লীসমাজে বাস করিবার মত মনের জোর বা ধৈর্য্য কোনটাই তাহার নাই।’’[৭৩]

দু’একদিনের মধ্যেই বিনয় কোলকাতায় রওনা হল। তাঁকে প্রণাম করবার জন্য মালতী এসেছিল। কোলকাতায় এসে কাজের চাপে বিনয়ের নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না তবুও সে একবার মরিয়া হয়ে যোগীনবাবুর সাথে দেখা করতে গেল ভালো চাকুরীর সন্ধানে। কিন্তু চাকুরীর প্রসঙ্গ তুললেই যোগীনবাবু তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন।

নীহরের গায়ে হলুদের দিন মালতীও এসেছে তাদের বাড়ি। গায়ে হলুদ-লোকাচারের খুঁটিনাটি মালতী দেখছিল তাতে গ্রামেরই একজন মুখ টিকে ফিস ফিস করে মালতীকে শুনিয়ে বলে —

> ‘‘... দেখচিস কেমন আদেখ্‌লার মত চেয়ে আছে। বয়স হয়েছে, তবু বাপে বিয়ে দেবার গা করে না। সময়ে বিয়ে হলে এতদিন দু ছেলের মা হ’ত।’’ [৭৪]

মালতী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে দূরে সরে এসে দাঁড়ায়। দূরে সরে এসেও নিস্তার নেই বিনয়ের ভাই অতুল মালতীর সাথে অভদ্রচিত্তে আচরণ করে। মালতী নিজের বাড়ি ফিরে যায়। নীহারদের ওখানে আর যায় না।

নীহারের স্বামীকে দেখে তার ভাশুরের কথা শুনে বিনয়ের মনটি অবসাদে ভরে ওঠে। সে ভাবে কী করে নীহার ঐ অভব্য অরুচিকর লোকেদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবে। সেইসঙ্গে এটাও ভাবে —

> ''স্বামী যেমনই হোক, হিন্দুর মেয়ে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর বিচার-ও করে না। তাদের বাঁচায় তাদের বহুজন্মসঞ্চিত মনের আদর্শ পূজা। নীহার সেই বাঙ্গালীর মেয়ে।''[৭৫]

বোনের বিয়ে হওয়ার পর কোলকাতায় এসে বিনয়ের সেই রুটিন বাঁধা জীবনে হাড় ভাঙা খাটুনি; পূজার পর আবার সে গ্রামে এল। ভাই অতুলের আরও অধঃপতন হয়েছে। মালতীর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। পঞ্চাশ বছর বয়সী বিপিনের সঙ্গে কারণ বিনে পয়সায় এর চেয়ে ভালো পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

পূজার ছুটিতে বিনয় বাড়ি আসার পর বোনকে কিছু দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এসে বাড়িতে রাখে। বোন নীহার বাপের বাড়ি এসে বাড়ির সর্বত্র একটা আনন্দের ঢেউ তোলে। একদিন বন্ধু মালতীকেও জোর ডেকে অনে, সে সময় নীহারের মা বাড়ি ছিল না নইলে মালতীকে বাড়িতে ডেকে আনা সম্ভব হত না। বিনয়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতা শোনার পর মালতীর নিজের ব্যথিত হৃদয়ের আবেগ কবির বাণীর সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছিল। বিনয় মালতীকে বলে যে বহু ক্লেশ বিনা কারণে সহ্য করেও মালতী নিজে যখন তার বাবার ঠিক করা পঞ্চান্ন বছরের বিপিনের সঙ্গে বিয়ে করা মনস্থ করেছে সটা নেহাতই ভুল পথ। কারণ, যত বড় অসুবিধাই হোক না কেন মানুষের জীবনটা হেলায় নষ্ট করে তাকে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। বিনয় আরও বলে —

> ''আমাদের দেশের মেয়েরা এতই নিরূপায়, অসহায় কিন্তু অন্য দেশের মেয়েদের পানে চেয়ে দেখ - তারা এমন নয়।''[৭৬]

মালতীও এর উত্তরে বলে —

> ''... অন্য দেশের কথা তুলচেন, তাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা মানুষ, কিন্তু আমরা যে শুধু মেয়ে মানুষ।''[৭৭]

মালতী এর কারণ হিসাবে বলে —

> ''... আমাদের কাছে আপনারা কখনো বড় কিছু দাবী করলেন না। আমাদের কাছে চাইলেন শুধু মেয়েমানুষ হয়ে থাকা। অন্য দেশের সে বিশ্বগ্রাসী দাবী কই আপনাদের?''[৭৮]

এর কিছুদিন পর যখন বিনয়ের জ্বর ম্যালেরিয়ার মতো হয় তখনও মালতী সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে বিনয়ের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ঐ অসুস্থ শরীরে বিনয়েরও আবেগ ফেটে পড়েছে। সে মালতীকে জানিয়ে দেয় যে মালতী যদি তার সাহায্য চায়, বিপদে তাকে পাশে পেতে চায় তবে সেও মালতীর পাশে থাকবে। বিনয় যে মালতীকে চায় — একথা ভালো করে বোঝার পর মালতীরও আর নিজের জীবনকে নষ্ট করতে ইচ্ছা করল না। বিপিন বুড়ার সঙ্গে আসন্ন বিবাহকে ভেস্তে দিতে মালতী তার মামীমাকে চিঠি লিখল; তাকে এই পাড়া গাঁ থেকে নিয়ে যাবার জন্য।

যথাসময়ে মালতীর মামাতো ভাই সুধীর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করে; মালতীও কাকভোরে তিন মাইল পথ হেঁটে পৌঁছে যায় স্টেশনে; ভোরের ট্রেনেই তারা কোলকাতা রওনা হয়। এদিকে ঘুম থেকে উঠেই মেয়েকে দেখতে না পেয়ে পিতা অনন্ত-র দুশ্চিন্তা হয়।

মালতী কোলকাতায় এলে সুধীর এদিন বিনয়ের কাজের ওখানে গিয়ে বিনয়কে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। মালতীকে সুস্থ, ভালো দেখে বিনয় দুশ্চিন্তামুক্ত হয় এবং মামীমার সঙ্গে কথা বলে মালতীর সঙ্গে তার বিবাহের তারিখ স্থির করে। মামীমার তত্ত্বাবধানে বিবাহ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হলে অনন্ত এসেও মেয়ে মালতীকে আশীর্বাদ করে।

উপন্যাসটিতে দেখি উপন্যাসের নায়িকা মালতী শুধু আধুনিকাই নন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তার আসন্ন বিপদের সমাধান মালতী নিজেই করেছে। মৃদুভাষী, দৃঢ়তেচা এমন মেয়ে সে সময় বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরে মোটেই সুলভ ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এতদিনের চলে আসা নিয়মকে সে ভেঙে ফেলেছে। তার বুদ্ধিমত্তা ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে প্রেসিডেন্সীতে পড়া তার মামাতো ভাই সুধীরই বলে ফেলেছে —

> '' কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের চিরকালের প্রথাকে লঙঘন করে কেমন করে তুই
> এতটা সাহসী হয়ে উঠ্‌লি ভেবে আমার অবাক লাগে।''[৭৯]

'জীবন ধারা' —

উপন্যাসের শুরুতেই লেখিকা আশালতা লিখছেন - 'চন্দ্রনথবাবু বেহারের একজন প্রসিদ্ধ উকীল।'[৮০] উপন্যাসের শুরুটা শরৎচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ায়।

খুব সংক্ষেপে চন্দ্রনাথবাবু সম্পর্কে লেখিকা তথ্য দিচ্ছেন। তার বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি লোকের

মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগায়। অতি দরিদ্র মেধাবী ছাত্র হিসাবে জীবন শুরু করে আজ চন্দ্রনাথবাবু একজন নামজাদা উকিল। মান সম্ভ্রমের সঙ্গে টাকা-কড়িও যথেষ্ট। চন্দ্রনাথবাবুর তিন ছেলে, বড় ও মেজ ছেলের বিবাহ হয়েছে। ঘরে পুত্রবধূ নাতি-নাতনী আছে। স্ত্রী মারা গেছেন তবে ছেলের বৌরা খুবই যত্ন করে। বড় ছেলেও উকীল, মেজছেলে জায়গা জমি দেখাশুনা করে বাঁকুড়ার দিকে। ছোট ছেলে বিলেত যাবে। রক্তচাপ বেশী হওয়ায় এবং বার্ধক্যজনিত কারণে সংসারের সকল দিক একরকম গুছিয়ে চন্দ্রনাথবাবু পরলোক গমন করেন।

চন্দ্রনাথবাবুর মেজছেলে নরেন্দ্রনাথের ওকালতি ব্যবসা ভালো না লাগায় সে যখন বাঁকুড়ার দিকে জমিদারি দেখাশোনার কাজে গেল তখন সেখানে এসে তার মধ্যে যে সুপ্ত কবি প্রকৃতি ছিল তাকে যেন পুনরাবিষ্কার করল। এষার মনে হতে লাগল এখানে স্কুল নেই, পার্টি নেই, সভ্যতা নেই, কোন তাড়াহুড়া নেই। এষা এখানে ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলি পড়ে এবং এই পরিবেশে এসব রূপকথার গল্পকে অলৌকিক বলে মনে হয় না, কারণ এষার জ্যাঠতুতো দিদিরা এষাকে বোকা ভাবে, এষা তার বিদূষী বোনেদের সভায় নিজেকে যেন বড় বিপন্ন অপ্রতিভ মনে করত। পাড়াগাঁ থেকে এষা তার স্কুলে যাচ্ছিল না ঠিকই কিন্তু সে তখন কালিদাসের কাব্য, ম্যাকবেথ অনুবাদ করছিল। এষার জ্যেঠিমা তাই এষাকে পূজার পর তাদের সঙ্গে কোলকাতায় নিয়ে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। এষার মা মন্দাকিনী দেবীরও ইচ্ছা এষা বেথুন কলেজে আই.এ পড়ুক।

এষা স্কুলে ভর্তি হয় ক্লাস নাইনে, স্কুলে প্রথম দিনই সে অনেকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সাফল্যের এবং জয়ের একটা মাদকতা তার তরুণ মনের দিগন্তে একটুখানি যে ঘনিয়ে আসেনি তাও নয়। তবে এষার নির্জনতাই বেশি পছন্দ। আর পছন্দ গান, গান শোনা ও শেখা।

এষার জ্যাঠতুতো দাদা প্রবীর পাড়াতে ক্লাবে, সভা সমতি এসব নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। তারই বন্ধু দেবেশ গরীব ছেলে, ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি.এ পড়ছে, গানও জানে খুব ভালো। এষার বয়স মাত্র এগারো বছর, তাই তাকে গান শেখাবার জন্য প্রবীর বাড়িতে বলে দেবেশকে গানের মাস্টার হিসাবে ঠিক করে দেবেশও এমন মনোযোগী ছাত্রী পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে তাকে গান শেখাতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, বয়সের তুলনায় বেশি ম্যাচিওর এষার সঙ্গে কথা বলতেও দেবেশের ভালো লগে। এষা দেবেশের কাছে এত ভালো গান শিখল যে যেকোন জলসা, সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গানের জন্য এষার ডাক পড়তে লাগল। সেইসঙ্গে দেবেশেরও নাম হল, অনেক মহিলাই তাদের মেয়েদের গান শেখাবার জন্য দেবেশকে রাখতে চাইল কিন্তু দেবেশ রাজি হয় না। সে শুধুই এষাকে গান শেখায়। এ নিয়ে দুএকজন বিরূপ মন্তব্যও করে, যা এষার কানে অত্যন্ত কটূ লাগে। ইতিমধ্যে এষা ছুটিতে তার বাবা-মার কাছে বাঁকুড়ার সারেঙ গ্রামে যায়। সেখানে প্রকৃতির কোলে একরকম নির্জন পরিবেশে অন্যদিকে তার বাবার লাইব্রেরিতে সে স্বচ্ছন্দে বহু বই পড়ে। তার পিতাও তার বয়সের দিকে না তাকিয়ে বড় বড়

বিষয়ও তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়। এষার পিতা তাকে সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান দিতে লাগল।

দেবেশ ইংরেজী অনার্সে ফাস্ট ক্লাস পেয়েছ, এম.এ পড়বে কলকাতায় তাই এই শহরে সে আর বেশিদিন নেই। এষার জ্যোঠামশাইয়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বাড়িতে। সেখানে এষারও বান্ধবীরা। যথা - সুবর্ণ, কণক, বীণা এসেছে, এসেই তারা দেখেছে এষা দেবেশের সঙ্গে কথা বলছে, তাদের মন্তব্য —

> ''বাব্বাঃ আজকের দিনেও নির্জ্জন কোণে ঢুকে মেয়ের গান না শিখলে চলে না!''[৮১])

— এ ধরনের মন্তব্য বলা বাহুল্য এষার অন্তরাত্মাকে বিষিয়ে তোলে।

এর আগেই দেবেশ এষাকে বলেছিল ' তুমি আর আমার কাছে একা গান শিখতে এস না। তোমাকে দেখতে আমার সারদিনই ইচ্ছা করে।' এষাও গর্বিত কণ্ঠে বলে - 'অন্যায় শুধু নয় অসুন্দর কোন কাজ জীবনে আমি কোনদিন করব না।'

এষার বয়স কম, ইতিমধ্যে অনেক বড় বড় কাব্য-সাহিত্য পড়েছে, শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝে শিখেছে, বড় বড় অনুষ্ঠানে বহু লোকের প্রশংসা পেয়েছে, সে ভালো ছাত্রীও বটে স্কুলেও দিদিমণিরা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, ঘরে জেঠিমা, জ্যাঠামশায়, মা-বাবা, সকলেরই সে আদরের ভালো মেয়ে, তার এই ভালো মেয়ে হওয়ার একটা চাপা গর্ববোধও ছিল আর এই অহংকারেই সে অনেক সময় তার মনকে না বুঝেই অনেক বড় বড় কথা বলে বসে বিশেষত তার গানের শিক্ষক দেবেশের কাছে।

এরপরও দেবেশ বার কয়েক এষাকে চিঠি দিয়েছে। এষাও দু একটা পত্রের উত্তর দিয়েছে কিন্তু এষার জ্যেঠিমা এ নিয়ে যখন একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছে তখনই আবার এষার সম্ভ্রমশালী মন প্রবল বিতৃষ্ণায় চিঠি লেখা কর্মটি থেকেও বিরত হয়েছে এবং দেবেশকেও চিঠি লিখতে মানা করে দিয়েছে।

পরীক্ষার পর দেবেশ যখন কলকাতায় আসে তখন সেখানে এষার বাবা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবেশের পরিচয় হয়। দেবেশের গান-বাজনা নরেনবাবুর খুবই ভালো লাগে, দেবেশের গান যে এষারও মন ছুঁয়ে যায় — সে তো বোঝাই যায়। দেবেশ যখন এষাকে বলে যে সে কোলকাতায় এষাকেই ধ্যান করেছে তখন এষা জানায় সে দেবেশবাবুকে মোটেই ধ্যান করেনি, দেবেশবাবু তার কাছে সহজ বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

ইতিমধ্যে এষার একটি বিবাহের সম্বন্ধ আসে। তারা ইংরেজদের সনদপ্রাপ্ত জমিদার; এষার মা মন্দাকিনী দেবী এ প্রস্তাব হাতছাড়া করতে চান না যদিও নরেনবাবুর এখনই মেয়েকে বিয়ে দেবার ইচ্ছা

নেই। মন্দাকিনী দেবীকে একথা বলাতে তিনি বললেন মেয়ের মতামত জানতে। মেয়ে এষার মধ্যে যে একটা আদর্শবাদ রয়েছে সেটা ভাঙতে নরেন্দ্রনাথ বলেন - জন্মান্তরের সংস্কারবশত হিন্দু মেয়েদের মধ্যে কম-বেশী মজ্জাগত সতীত্বের একটা ভাব রয়েছে। এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে হিন্দু মেয়েরা নিজেদেরও যেমন বঞ্চিত করে তাদের স্বামীদেরও বঞ্চিত করে।

এষাকে অরুণ যখন সবান্ধব দেখতে আসে তখন এষা অরুণের দিকে তাকায়নি। সে দেখেছিল শুধু তার চরণদুটি এবং তখন থেকেই এষা তার ভাবী বধূ জীবনের অবস্থাকে নানা রঙে মনে মনে কল্পনা করেছিল, আদর্শবাদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। এরপর সেই ভুল ভাঙল যখন শুভদৃষ্টির সময় সে তার স্বামীর মুখ দর্শন করে। সে মুখে একটা কঠিন ভাব, কর্কশ মুখশ্রী যাকে বলে। এরপর ফুলশয্যার রাতে তার স্বামী যখন তাকে বারে বারে বলে এখন থেকে সে জমিদার ঘরের কূলবধূ, কাজেই যখন তখন সে গাইতে পারবে না তখন এষা বোঝে কত বড় ভুল সে করেছে। এরপর বিবাহে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়ে দেবেশের যখন চিঠি আসে তখন সে চিঠি এষাকে না দিয়ে অরুণ নিজে তা পড়ে এবং এষাকে বলে দেয় বাইরের লোকের চিঠিপত্র যেন না আসে। বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে এষা যাকে মানসপূজায় কল্পনা করেছিল তার রূপ বাস্তবজগতে এসে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও তার দেহ-মনের একান্ত বিরূপতা সে কিছুতেই জয় করতে পারছে না।

এষার শ্বশুরবাড়িতে ধনের সঙ্গে আভিজাত্যের গরিমা ও চালচলন আদব কায়দার মর্যাদা বজায় রাখবার একটা উগ্র চেষ্টা রয়েছে। এষার স্বামী অরুণ যখন এষার সঙ্গে প্রথম দিন গল্প করার অছিলায় তাকে তাদের বাড়ীর চারপাশের পরিবেশ, কীভাবে এই সংসারে চলতে ফিরতে হবে — এসব সম্বন্ধে উপদেশ দেয় তখন এষাও জানায় যে এখন তার মনে হচ্ছে তার বাবার কথাই ঠিক। — ''... অতিরিক্ত আদর্শবাদ করতে যেয়ে সব জিনিষকেই ভুল বোঝে এষা।''[৮২]

অরুণের কর্কশ মুখের চেহারা, তারপর সব সময় কূলবধূ হিসাবে তার কী করণীয় - তা নিয়ে একটা অনুদার মনোভাব — এসব দেখে শুনে অরুণ সম্পর্কে এষার মন বিষিয়ে ওঠে। যে প্রথমদিনই বুঝতে পারে আদর্শবাদ করতে গিয়ে কত বড় ভুল সে করেছে। এরপর এষার বিয়েতে না এসে শুভকামনা নিয়ে দেবেশ যে চিঠি এষাকে দেয় তা প্রথমেই এষাকে না দিয়ে তা খুলে পড়ে অরুণ — এ ঘটনাটাও এষার ভালো লাগেনি। শুধু তাই নয়, ঘটনাটিতে তার আত্মসম্মানেও আঘাত লাগে। সে বলে —

> 'কোন্‌টা আদর্শ আর কোন্‌টা আদর্শ নয়, তা আমি জানিনে। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, কথা বার্তার মধ্যে ক্রমাগত আপনি 'ঘরের বৌ' কথাটা ব্যবহার করছেন। 'ঘরের বৌ' ছাড়া আর কি আমার কোন পরিচয় নেই?'[৮৩]

যাই হোক প্রথমদিনই স্বামী-স্ত্রীর এ ধরণের আলাপ চারিতায় অরুণের মনটাও বিষাদপূর্ণ হয়ে

ওঠে। এরপর অরুণ যখন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে কাছে আসে তখনও এষা তাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। ''সে যাহাকে মানসপূজায় কল্পনা করিয়াছিল, তাহার রূপ বাস্তব জগতে আসিয়া একেবারে অন্যরকম হইয়া গেছে।''[৮৪] তার দেহ মনের এই যে একান্ত বিরূপতা সে কিছুতেই দূর করতে পারছে না।

এরপরে আবার রয়েছে শ্বশুরবাড়িরর জমিদারীর ঠাট বজায় রখার একটা উগ্র চেষ্টা। সেইসঙ্গে তাদের বংশের একমাত্র বধূর কেমন চালচলন হওয়া উচিত সেই নিয়ে শ্বশুরবাড়ির সকলের অতি সতর্ক ব্যবস্থায় এষা আরও হাঁপিয়ে উঠল দুদিনেই। বিয়ের পরে তাদের জ্ঞতি-বন্ধুরা সকলেই এক-একদিন করে নতুন বৌকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছেন। এমনই একদিন অরুণ ও এষার নিমন্ত্রণ ছিল চক্রবর্তীদের বাড়ি যাদের অবস্থা এখন পড়ন্ত। ঐ বাড়িরই মেয়ে বাণী যে কোলকাতায় এম.এ. পড়েছে। তার সঙ্গে এবং ঐ বাড়ির অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে এষা যেন বেশি কথা না বলে কিংবা অনুরোধ যেন যখন তখন গান গাইতে না বসে — শাশুড়ি পুত্রবধূকে একথা বলে দেয়। এসব কথা শুনেও এষা নির্বিকার - পরে অরুণ যখন বিশেষ জোর দিয়ে তার মনোভাব জানতে চায় তখন এষা বলে —

> ''আমি তোমাদের বাড়ীর সম্পত্তি? তোমাদের সম্পত্তি ছাড়া কি আমার আর অন্য পরিচয় নেই?'' [৮৫]

অরুণের মনে হয় এমন অর্থ সম্পদ এবং খোশামুদে স্বামী পেয়েও এষা যে এমন সব সময় কাঁদছে তার কারণ বোধহয় এষা বিয়ের আগে থেকেই কাউকে ভালাবাসত এবং বিয়ের পর স্বামীকে সে ভালবাসতেই পারছে না।

একথা এষাকে চমকে দিলেও অরুণ বলে এটাই সত্য কারণ এষার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে এটাই কেবল তার মনে হয়েছে।

এদিকে চক্রবর্তীদের বাড়ি নিমন্ত্রণে এসে বাণী নামে মেয়েটির কাছে এষা শোনে দেবেশের কথা। দেবেশ বাণীদের ইউনাভির্সিটির ইংরেজীর অধ্যাপক। বাণী আবার তাঁর কাছে গানও শেখে। কথায় কথায় বাণী বলে দেবেশবাবুর মতো লোককে ছেড়ে শুধুমাত্র অর্থ সম্পদের জন্য অরুণকে বিয়ে এষার মত মেয়ে কেমন করে করতে পারল? এতে এষা জানায় অর্থ নয় শুধু তার মা জেঠিমাদের শুচিশুভ্র জীবনকে দেখেই সেও সতীলক্ষ্মী হয়ে স্বামীর সংসার করবে — শুধুমাত্র এই ভাবনা থেকেই তার বিয়েতে মত দেওয়া কিন্তু এখন সে উপলব্ধি করতে কত বড় ভুল সে করেছে। না বুঝে সে নিজেকেই ঠকিয়েছে।

সেই রাতে অরুণ আর এষার মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরপর অরুণ যখন জানতে চায় এষা দেবেশকে ভালবাসত কিনা এর উত্তরে এষা জানায় দেবেশ এষাকে ভালবাসলেও সে কোনদিন দেবেশকে

ভালবাসে নি, একথা শুনে অরুণ প্রাণপণে এষাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায় কিন্তু এষা জানায় দেবেশ নয় অরুণদের বাড়ির দমবন্ধ হওয়া কয়েদখানা থেকে সে ফিরে যেতে চায় তার বাবার কাছে। তাই সে তার বাবাকে সমস্ত লিখে এষা তার ক্ষোভ উগরে বলে —

> ''আমি কারও সম্পত্তি নই, আমি মানুষ এটা প্রতিনিয়ত প্রতি-মুহূর্তে আমার মনে পড়ে। অথচ এটাকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলতে না পারলে তোমাদের ঘরে থাকা অসম্ভব। বিয়েটা যে এমন একটা জুয়া খেলা এ কথা তো আমি জানতাম না। কিন্তু প্রত্যেক ছোটখাটো ভুলের যখন সংশোধন আছে, তখন এরও নিশ্চয় আছে।''[৮৬]

এষা বলে সে বাবার কাছে ফিরে গিয়ে আবার পড়শুনা শুরু করবে। অরুণ বলে সে তার স্ত্রীর পড়াশুনার ব্যবস্থাও তাদের বাড়িতেই করে দেবে এবং তার স্বাধীন চলফেরায় তাদের বাড়ির কেউই আর তাকে বিরক্ত করবে না।

বাণী এরপর এষার কাছে এসে ক্ষমা চায় এবং জানায় অরুণই বাণীকে এষার কাছে আসবার জন্য বলে এসেছিল। বাণী এও বলে অরুণ খুবই ভালবাসে এষাকে এবং এষা ও অরুণের মধ্যে কোনরকম ভুল বোঝাবুঝি হয় বাণীর কোন বিশেষ কথার জন্য তা বাণীর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাজনক। কাজেই এষা যেন নিজের দাম্পত্য সম্পর্কে যে ভুল বোঝাবুঝি - মত বিরোধিতা অচিরেই মিটিয়ে ফেলে। বিশেষত ঐ দিন দেবেশকে নিয়ে এষাকে অত কথা বলার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। তা হল বাণীর সঙ্গে দেবেশের বিয়ের একটা সম্বন্ধ হয়েছিল কিন্তু দেবেশ রাজি হয়নি; এর কারণ হিসাবে দেবেশ বাণীকে বলেছিল যে এষা নামের একট মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল। তার জায়গায় সে অন্য কোন মেয়েকে বসাতে চায় না। একথা শুনে এষা বাণীকে বলে বাণী মিথ্যাই ভাবছে কারণ এষা কোনদিনই দেবেশকে ভালোবাসেনি এবং তার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে যাবার ইচ্ছার পেছনে ঐ দেবেশের কোন ভাবনাই এর জন্য দায়ী নয়। শ্বশুরবাড়ির সেকেলে দমবন্ধ করা পরিবেশে এষা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না বলেই সে পিতার কাছে চলে যেতে চায়।

এষার চিঠি পেয়ে পিতা নরেন্দ্রনাথ একটুও অবাক হলেন না শুধু ভাবলেন তার আশঙ্কা এত দ্রুত ফলপ্রসু হবে এ ধারণা তাঁর ছিল না। যাইহোক স্ত্রী মন্দাকিনী যে এসবের জন্য দায়ী তা ভেবে নরেন্দ্রনাথের একটু রাগই হল কিন্তু স্ত্রী যখন বলে যে তিনি নন বরং মেয়ের এই বয়সে এমন ভাবপ্রবণ হওয়া এবং আর পাঁচজন সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত যে এষা হল না এসবের জন্য দায়ী তার পিতার শিক্ষা, কারণ এষাকে ছোট থেকেই নরেন্দ্রনাথ কঠিনতম জ্ঞান চর্চায় কাব্য পাঠে, সঙ্গীত সাধনায় এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যে এষার মন রুচি-বিচারবোধ সবই এমন উঁচু সুরে বাঁধা হয়ে গেছ

যে সে আর সাধারণ মেয়ের মত অতি সহজ সেকেলে বাঙালী হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরের মর্যাদা হানিকর আচরণকে মেনে নিতে পারছে না। বলা বাহুল্য কথাটির সত্যতায় নরেন্দ্রনাথ হতচকিত হন।

আসলে এষার পিতা ভেবেছিলেন মেয়ের বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলে মেয়ে তার জ্ঞান বুদ্ধি মতো নিজেই সৎ পাত্র নির্বাচন করে নেবে। কিন্তু বিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ তখনওএত উন্নত হয়নি যে তারা মেয়ের উপযুক্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বিয়ে না দিয়ে। কাজেই নরেন্দ্রনাথের ঐধরনের ভাবনা কোন কাজেই আসে না। মা জেঠিমা একরকম কৌশল করেই এষাকে বেশি বোঝা শোনার অবকাশ না দিয়েই বাঙালী মেয়েদের কেমন সংস্কার হওয়া উচিত সেসব পাখী পড়ার মত শিখিয়ে এষাকে বিয়ের পিড়িতে বসিয়ে দেয়, ঘটনার আকস্মিকতায় নরেন্দ্রনাথও বেশি বাধাদিতে পারেন না।

এষা তার শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নিতে পারেছে না এমন খবর যখন বিমলা দেবী জানতে পারেন তখনও তিনি এর সহজ সমাধান করে ফেলেন। দেবরের সমস্ত দুশ্চিন্তা নস্যাৎ করে তিনি বলেন — এষা একটু স্বাধীন মতাদর্শে বেড়ে উঠেছে তাই সাবেক কালের রীতিনীতি মানিয়ে নিতে তার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কালে ছেলেপিলে হলে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

এষাকে নরেন্দ্রনাথ আনার কথা ভাবছেন এমন সময় অরুণই এষাকে নিয়ে তার বাপের বাড়ি এল। তারা এখান থেকে দার্জিলিং যাবে।

একান্তে পিতা-কন্যার কথা হল, এষা তার পিতাকে জানাল যে তার জন্য তার স্বামী সব কিছুই করতে প্রস্তুত। তার শ্বশুরবাড়ির সাবেককালের নিয়মে বাঁধা জীবন থেকে দূরে কেবলমাত্র এষার ভালো লাগবে বলেই তারা দার্জিলিং-এ বেশ কিছুদিন থাকতে যাচ্ছে। তবুও এষা চায় পিতার কাছে থেকে আবার লেখাপড়া করবে। এসব শুনে পিতা বলেন যে এখন আর তা হয় না কারণ —

> ‘‘একটা তীর যখন ছুঁড়ে দেওয়া হয় তখন ইচ্ছে করলেই সেটা আর তূণে ফিরিয়ে আনা যায় না। তুমি যেখানে ফিরে আসতে চাইছ, সেখান থেকে যাত্রা করে বাইরে বেরিয়ে গেছ।’’[৮৭]

তিনি তার মেয়েকে আরও বলেন যে —

> ‘‘... সংসার যাত্রায় যেখানে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সম্বন্ধগুলো এত কাছাকাছি জট পাকিয়ে যায় সেখানে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দিয়ে টাটাটানি করে খুলতে গেলে অনেকের মনে ক্লেশ দেওয়া হয়।’’ [৮৮]

এষার জ্যাঠাইমা বিমলা দেবীও প্রায় একই কথা বললেন তাকে। আরও বললেন —

''... মেয়ে মানুষের জীবনে দিন রাত অত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই বুঝি চলে? সবাইকে সুখী করবি, সকলের সেবা করবি, প্রত্যেকের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিবি — এতে যে কত শান্তি কত তৃপ্তি, তোকে ব'লে আর বোঝাব কি! নিজের কথাটা অত করে ভাবা ছেড়ে দে।...''[৮৯]

এষাও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল এখন আর পিতৃগৃহে থেকে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকলে চলে না। মাঝে মাঝে এষার আবার মনে হয় সে হয়তো তার জেঠিমার মতো সতী নয়। যোগ্য নয় তবু সেও চায় পুণ্যের জ্যোতিতে যেন সে সংসারের সকল লোকের মনে আনন্দ-শান্তি এনে দিতে পারে।

যাই হোক গঙ্গার ধারে তার সঙ্গে দেবেশের দেখা হয়। দেবেশ জানায় সে আরও উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাচ্ছে। বিলেত যাবার জন্য টাকাটা অবশ্য সে এষার বাবারথেকেই আপাতত ধার নিচ্ছে এবং শীঘ্রই সেটা সে শোধও করে দেবে। দেবেশ এষাকে বলে সে আর যাই করুকনিজে যেন অন্তত সে সুখী হয় কোনভাবেই নিজেকে যেন সে কষ্ট না দেয়। দেবেশ বলে —

> ''তোমার জীবনের পথে একটি কাঁটা দূর করবার জন্য যদি আমাকে শতবার দূরে চলে যেতে হয় তা যাব। কিন্তু আমার কথা অতি তুচ্ছ, তোমার সুখের দাম তার চেয়ে অনেক বেশী।''[৯০]

এষা জানায় —

> ''...আপনার কী দোষ রয়েছে? আমার স্বভাবই এই রকম। একটু বেশী কল্পনা প্রবণ আর আদর্শবাদী নিজের মনের খেয়লের ঝোঁকে আমি সবাইকে কষ্ট দিই। আপনাকেও হয়তো দিয়েছি।''[৯১]

কথায় কথায় জানা যায়, বিলেত যাবার সকল পরিকল্পনাই এষার বাবারই। দেবেশ বলে যে এষার পিতার ওপর তার খুবই শ্রদ্ধা। তিনি যা জানেন - বোঝেন সেটা হয়তো অনেকেই বোঝে না।

সূর্যাস্তের শেষ আভায়, গঙ্গার তীরে স্রোতের জল ছল ছল শব্দে উপন্যাসের শেষ পর্যায় একটি কাব্যিক সুষমায় মন্ডিত হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে এষার মনেও একটা প্রশান্তি বিরাজ করছে; তার মনে গানের কলি ভেসে ওঠে —

''আমার কিছু ধন আছে সংসারে
বাকী সব ধন স্বপনে নিভৃত স্বপনে।''[৯২]

'সমর্পণ' —

উপন্যাসটি ১৩৪০ সালে 'বিচিত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত আশালতা সিংহের লেখা 'সুরমার সংযম' গল্পটির বৃহৎ সংস্করণ রূপে ধরা হয়। উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে ১৩৪১-এর ভাদ্র থেকে চৈত্র সংখ্যায় 'জয়শ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালে। গল্পের নায়ক-নায়িকাদের নাম উপন্যাসেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

উপন্যাসে একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে। এই পরিবারের গৃহবধূ ও মেয়েরা শাড়ি, গহনার আলোচনা করলেও কেউ কোনো বাংলা মাসিক পত্রিকার খোঁজও রাখত না। পরিবারটি দাদামশায়ের মৃত্যুর পর ভেঙে যায়, একান্নবর্তী পরিবার ছোট ছোট পরিবারে পৃথক হয়ে যায়। সুরমাকে সব দিক থেকে আধুনিকা করে তুলতে তার মায়ের প্রচেষ্টার খামতি ছিল না কিন্তু সুরমার মেকি আধুনিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা। এই সময় ওষুধ কোম্পানীর এজেন্ট হরলালের সঙ্গে সুরমার পরিচয় হয়। হরলাল সুরমাকে ফ্রেঞ্চ শেখায়। কোলকাতাতেসুরমারা থাকতে শুরু করলে সুরমার দাদা ধীরেনের বন্ধু সুপ্রকাশের সঙ্গে সুরমার আলাপ হয়। মা মন্দাকিনী হরলালের সঙ্গে সুরমার বিবাহ দিতে চাইলে সুরমা আপত্তি জানায়। কারণ তার সঙ্গে হরলালের বিস্তর মানসিক ব্যবধান। সুপ্রকাশের মধ্যে নিঃসঙ্গ নৈরাশ্যপীড়িত তরুণ যুবকের ছবি লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশের বাড়িতে এসে সুপ্রকাশকে দেখে সুরমার মনে আনন্দের ছোঁওয়া লাগে, সে মুগ্ধ হয়।

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন — 'গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ইহার পরিকল্পনার উপযোগী হয় নাই।'[৯৩]

তথ্য সূত্র ও প্রসঙ্গ নির্দেশ

১) আশালতা সিংহ ঃ 'দুই নারী', দ্র. সন্তোষ মজুমদার ও মায় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আশালতা সিংহ রচনাবলী', বিহার বাংলা আকাডেমি, মার্চ, ১৯৯০, পৃ. ৮৭

২) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৩২

৩) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৩৫

৪) দ্র. তদেব

৫) দ্র. বনফুল, 'আশাহতা' (ব্যঙ্গ কবিতা)

৬) দ্র. পরিমল গোস্বামী ঃ 'স্মৃতিচারণ' শ্রাবণ, ১৩৬৫

৭) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'মানসী', প্রকাশ চন্দ্র সরকার অ্যান্ড কোং, ২০ জুলাই, ১৯৩৪, অধ্যায় আট

৮) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, অধ্যায় পনেরো

৯) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'বিয়ের পরে', কমলিনী সাহিত্য মন্দির, ২৪ ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃ. ৭৭

১০) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৪

১১) দ্র. আশালতা সিংহ, 'আবির্ভাব', ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৫, পৃ. ২

১২) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪

১৩) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩

১৪) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩০

১৫) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩০

১৬) দ্র. আশালতা সিংহ, 'অষ্টমী', কাত্যায়নী বুক স্টল, অগ্রাহায়ণ, ১৩৪২, অধ্যায় সাত

১৭) তদেব

১৮) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'কলেজের মেয়ে', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, পৃ. ৬

১৯) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১

২০) দ্র. ঐ

২১) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৬

২২) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮১

২৩) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৯-১০০

২৪) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১১

২৫) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'একাকী', কমলা পাবলিশিং হাউস, ৩ জুন ১৯৪০ পৃ. ৬

২৬) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮

২৭) দ্র. ঐ

২৮) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৪

২৯) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৯

৩০) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭০

৩১) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮৮

৩৩) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০

৩৩) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৫

৩৪) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৭

৩৫) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৩

৩৬) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২০

৩৭) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৩

৩৮) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৮

৩৯) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৪

৪০) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৯

৪১) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬১

৪২) দ্র. ঐ

৪৩) দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬২

৪৪) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'ভুলের ফসল', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, আশ্বিন, ১৩৫২, অধ্যায় ছয়।

৪৫) দ্র. তদেব, অধ্যায় ষোল।

৪৬) দ্র. ঐ

৪৭) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'মুক্তি', 'আশালতা সিংহ রচনাবলী', সন্তোষ মজুমদার ও মায়া ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিহার বাঙ্‌লা আকাডেমি, মার্চ ১৯৯০। পৃ. ২৮৫

৪৮) দ্র. তদেব, পৃ. ২৮৯-২৯০

৪৯) দ্র. তদেব, পৃ. ৩২১

৫০) দ্র. তদেব, পৃ. ৩২২

৫১) দ্র. তদেব, পৃ. ৩৬৮

৫২) দ্র. তদেব, পৃ. ৩৭৫

৫৩) দ্র. তদেব, পৃ. ৩৮৯

৫৪) দ্র. তদেব, পৃ. ৩৮৫

৫৫) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'বাস্তব ও কল্পনা', কমলা পাবলিশিং হাউস, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ২০

৫৬) দ্র. তদেব পৃ. ৩৫

৫৭) দ্র. তদেব, পৃ. ১৪৯

৫৮) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'নূতন অধ্যায়', মডার্ন পাবলিশিং সিন্ডিকেট, ফাল্গুন ১৩৪৫, পৃ. ১

৫৯) দ্র. তদেব, পৃ. ৬

৬০) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'ক্রন্দসী', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ৫ আগস্ট, ১৯৪০ পৃ ৮

৬১) দ্র. তদেব, পৃ. ১৫

৬২) দ্র. তদেব, পৃ. ২৬

৬৩) দ্র. তদেব, পৃ. ৩৮

৬৪) দ্র. ঐ

৬৫) দ্র. তদেব, পৃ. ৪১

৬৬) দ্র. তদেব, পৃ. ৫১

৬৭) দ্র. তদেব, পৃ. ৫৭

৬৮) দ্র. তদেব, পৃ. ৫৮

৬৯) দ্র. তদেব, পৃ. ১৪০

৭০) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'স্বয়ম্বরা', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯ জানুয়ারী, ১৯৪৩, পৃ. ২৪

৭১) দ্র. তদেব, পৃ. ৩১

৭২) দ্র. তদেব, পৃ. ৫৩

৭৩) দ্র. তদেব, পৃ. ৭৩

৭৪) দ্র. তদেব, পৃ. ৮২

৭৫) দ্র. তদেব, পৃ. ৯৩

৭৬) দ্র. তদেব, পৃ. ১১৮

৭৭) দ্র. ঐ

৭৮) দ্র. তদেব, পৃ. ১১৯

৭৯) দ্র. তদেব, পৃ. ১৩২

৮০) দ্র. আশালতা সিংহ ঃ 'জীবনধারা', ফাই আর্ট পাবলিশিং হাউস, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ১

৮১) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৩

৮২) দ্র. তদেব, পৃ. ৪৪

৮৩) দ্র. তদেব, পৃ. ৬২

৮৪) দ্র. তদেব, পৃ. ৯৪

৮৫) দ্র. তদেব, পৃ. ৯৭

৮৬) দ্র. তদেব, পৃ. ১০৬

৮৭) দ্র. তদেব, পৃ. ১১৫

৮৮) দ্র. ঐ

৮৯) দ্র. তদেব, পৃ. ১১৬

৯০) দ্র. তদেব, পৃ. ১১৯

৯১) দ্র. ঐ

৯২) দ্র. তদেব, পৃ. ১২০

৯৩) দ্র. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সী, সপ্তম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৩৩৪